বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি

আসকার ইবনে শাইখ

বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি

আসকার ইবনে শাইখ

সাত রং প্রকাশনী

www.pathagar.com

বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি

আসকার ইবনে শাইখ

প্রচ্ছদ-শিল্পী : শেখ তোফাজ্জল হোসেন

সর্বস্বত্ব গ্রন্থকারের

প্রথম প্রকাশ : একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬

প্রকাশক :
সাতরং প্রকাশনী, ২৫ গ্রীন কর্নার, গ্রীন রোড,
ঢাকা—৫, বাংলাদেশ

মুদ্রণ :
দিন কাল মুদ্রায়ণ
৩৪/২, নর্থ ব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য : চল্লিশ টাকা / দুই ইউ. এস. ডলার

BANGLA MANCHA-NATYER PASHCHATBHUMI
(The Background of Bengali Stage Drama)
By Askar Ibne Shaikh

Price : Tk. Forty/U. S. Dollar 2 only

www.pathagar.com

বাংলাদেশের নাট্যকর্মী ও নাট্যামোদীদের হাতে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের বক্তব্য

এমনিতে আমি কোন প্রবন্ধকার নই। বহুকাল থেকেই প্রধানত নাটক রচনায় মনোনিবেশ করে এসেছি ; মাঝে মধ্যে কখনো প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা করেছি। কিছুদিন আগে দৈনিক ইত্তেফাক-এর সাহিত্য-সম্পাদক সুকবি আল মুজাহিদী সাহেব আলাপ প্রসঙ্গে আমাকে পুরনো দিনের নাট্যক্ষেত্রের কিছু স্মৃতি-কথা লিখতে অনুরোধ জানান। তাঁর কথাবার্তা থেকে আমি বিশেষ করে অনুধাবন করি যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১—এই সময়টায় এদেশে নাটকের জন্য যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল এবং আমরা যে নাট্য-প্রয়াস চালিয়েছিলাম, তার কথা আজকের দিনে অনেকে প্রায় ভুলেই গেছেন এবং আজকের নাট্যকর্মীরা ওই সময়টার কথা প্রায় জানেন না বললেও চলে। অর্থাৎ কমিউনিকেশন গ্যাপ্ যা ঘটে গেছে তা দূর করার মত একটা দায়িত্ব আমার রয়েছে—এ কথাটাই যেন তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের দায়িত্ব না নিয়েও নাটক সম্পর্কে কিছু লিখব বলে তাঁকে কথা দিলাম। পরে ভেবে-চিন্তে স্থির করলাম, স্মৃতি-কথা না হয় লেখা যাবে পরে; বরং বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমির কথাই তুলে ধরি! তদনুযায়ী দশটি প্রবন্ধ লিখে আল মুজাহিদী সাহেবকে দিলাম এবং সেগুলো তিনি ইত্তেফাকে প্রকাশও করলেন। তখন অনেকের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছি লেখাগুলোর জন্যে। আর সে-প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বই আকারে তা ছাপার বন্দোবস্তও করে ফেললাম। তাই 'বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমি'র আত্মপ্রকাশের দিনে আল মুজাহিদী সাহেবকে স্মরণ করছি এবং তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তবে নিজের টাকায় বইটা প্রকাশ করতে হয়েছে বলে 'টের পাওয়া' যাকে বলে, সেই টেরটুকু যথেষ্ট পরিমাণেই পেয়েছি। এখন কাজটা ভালই করেছি—একথাটা কেউ কেউ যদি বলেন, তবেই সান্ত্বনা।

উপরোক্ত দশটি প্রবন্ধে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এসেছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, উনিশ শ' সাতচল্লিশোত্তর কালে তখনকার নতুন পরিস্থিতিতে

www.pathagar.com

আমাদের যে নাট্য-প্রয়াস, তা-ও ছিল আমাদের এখানকার নাটকের জন্য পশ্চাৎভূমি নির্মাণেরই একটি প্রয়াস! সেই নির্মাণ-কাজ কবে শেষ হয়েছে, অথবা শেষ হয়েছে কিনা—এ সম্পর্কে রায় দেয়ার মত জ্ঞান-গরিমা আমার নেই। তবে আমাকে যদি কেউ প্রশংসার মনোভাব নিয়েই বলেন ঃ এতদিন নাটকের পেছনে লেগে থেকে তো.....ইত্যাদি ইত্যাদি, তা হলে আমি নির্দ্বিধায় বলব—এতদিন ধরে তো আমাদের নাটকের জন্য পশ্চাৎভূমির মতই কিছু একটা নির্মাণ করতে চেয়েছি!

এসব ভেবেই বই-এ এগারো অধ্যায়ে সাতচল্লিশোত্তর আমাদের মঞ্চ-নাট্য প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। এবং পরিশিষ্টে সংযোজিত করেছি 'যাত্রা ও নাটক' সম্পর্কে একটি পুরনো প্রবন্ধ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ বই-এর কাল-পরিধি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সীমিত।

এগারো অধ্যায়ে সাতচল্লিশোত্তর কালের যে নাট্যকৃতির বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা অনেকাংশে তথ্যমূলক। তখনকার নাট্যকারদের রচিত নাটক-সমূহের গুণগত মান সম্পর্কে তেমন কিছু বলা হয় নি। তাতে করে তখন যে উন্নত মানেরও বেশ কিছু নাটক রচিত হয়েছিল—এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে না ওঠারই কথা। এ ধারণাটা স্পষ্ট করার জন্যই এবার ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধ এখানে সংযোজিত করে দিচ্ছি। এ-ও বলে রাখছি, ওই প্রবন্ধে উল্লেখিত নাটকগুলির প্রশংসনীয় দিকগুলোই বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের বর্তমান (একাত্তর-পূর্ব) নাট্য-সাহিত্য প্রসঙ্গে

(১৯৬৯ সালের ৭ই মার্চের 'চিত্রালী'তে প্রকাশিত)

জীবনের রূপ ও প্রকৃতি সাহিত্যের আয়নায় ফুটে ওঠে। আর যেহেতু জীবনের এই রূপ-প্রকৃতি সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল, তাই সে রূপ-প্রকৃতি কালে কালে ভিন্ন ভাব নিয়ে প্রকাশ পায় সাহিত্যে। এবং জীবন যখন অশান্তি ও বিক্ষোভের মধ্যে ক্ষিপ্রগতি, তখন তার যে রূপ ধরা পড়ে নাটকে, সেই রূপই বাস্তবধর্মী বলে দর্শকের মন আকর্ষণ করে বেশি। আর তা হয়ে ওঠে উপভোগ্য। জীবনের দৃশ্যকাব্য হিসাবে নাটকের জন-মন রঞ্জনের ক্ষমতা যথেষ্ট এবং তা সমকালীন মন ও মানসের রূপায়নের

www.pathagar.com

উপর নির্ভরশীল। পরিবর্তনের ধারা-পথে আবার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে মহা-জীবনের এক শাশ্বত সত্য। সমকালকে স্বীকার করে নিয়ে যিনি তার অন্তর্বাণীকে সেই সত্য-সুন্দরের সঙ্গে সংযোজিত করেন, তিনিই প্রকৃত শিল্পী।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে নাট্য শাখার উৎপত্তি সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে কাল ও গতি নিয়ে মতের দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও সবাই কমবেশি একমত যে, নাট্যশাখা অপেক্ষাকৃত নবীন। এখানে আরেকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। নাট্য-সাহিত্য কি সাহিত্য-ধারায় ক্রমবিবর্তিত রূপ নিয়ে এগিয়ে যাবে, না তার নিজস্ব কোন পথে এগোবে? প্রশ্নটা কেন আসে তার খানিকটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। দেশের বৃহত্তর জন-সমাজের পছন্দ-অপছন্দের উপর নাট্যোন্নতি বিশেষভাবে জড়িত। নাটক রচিত হলে তা দেশময় অভিনীত হতে হবে। আর সেই নাটকই অভিনীত হবে বেশি, জন সমাজে যার আবেদন থাকবে বেশি। যে-নাটক এই গুণসম্পন্ন নয়, সে-নাটক যথেষ্ট সাহিত্য-মূল্যমন্ডিত হলেও জনপ্রিয়তার মাধ্যমে আর্থিক উন্নতির বড় একটা আশা করতে পারে না। আর সে অবস্থায় নাট্যকারের উৎসাহ-উদ্দীপনা বিশেষভাবে স্তিমিত হয়ে যাবার সম্ভাবনাই অধিক। ফলে নাট্যোন্নতি সম্পর্কেও চিন্তার কারণ ঘটবে বৈকি! কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য শাখার পরিস্থিতি যে কিছুটা ভিন্ন তা হয়তো আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। অনেকটা এই কারণেই প্রশ্নটা এসেছিল যে শিল্পের পথে অগ্রগমনে নাট্য শাখার পথ চলার স্বরূপ কি হবে! এ নিয়েও দেশে দেশে আজ তর্কের কমতি নেই। সমস্যাটার স্বরূপ আবার সব দেশে এক নয়। যে দেশে সাধারণ ও অসাধারণের জীবন-বোধ ও মানসোন্নয়নের মধ্যে ফারাক কম, সে দেশে সমস্যার গুরুত্বও অনেকটা লঘু। কিন্তু যেখানে শাসন-শোষণের প্রয়োজন ও তার জের থেকে উদ্ভূত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পরিস্থিতি সে ফারাককে অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছে, সেখানে এ সমস্যাকে মোটেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না। অথচ আগেই বলা হয়েছে, নাট্যোন্নতির জন্য অন্যতম প্রয়োজন বৃহৎ জনসমাজের যথাসম্ভব জীবন-বোধ, মানস ও রুচি-সাদৃশ্যের। অন্য কথায় তাদের সহ-যোগিতার। আমরা মনে করি, আমাদের দেশে এ সমস্যা যথেষ্ট পরিমাণে বিরাজমান। উদাহরণ স্বরূপ বাংলা চলচ্চিত্রের পরিস্থিতি এখানে টেনে আনা যেতে পারে। এদেশে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রথম দিককার প্রচেষ্টাকে সামগ্রিক সাহিত্য-প্রচেষ্টার অনুগামী বলা যেতে পারে। আমাদের সম-কালীন উপন্যাস, সমকালীন গল্পের উপরেই সাধারণত তখন ছবি তৈরী হয়েছে। সেসব ছবির নির্মাণ কৌশল খুব উন্নত মানের না হলেও

www.pathagar.com

আজকের তুলনায় খুব অনুন্নত ছিল না। মহীউদ্দিন সাহেবের 'শীত বিকেল', 'রাজা এলো শহরে', সালাউদ্দিন সাহেবের 'ধারাপাত,' জহীর রায়হান সাহেবের 'কখনো আসেনি,' 'কাঁচের দেয়াল,' খান আতাউর রহমান সাহেবের 'অনেক দিনের চেনা' ইত্যাদি বাংলা ছবি ছিল আমাদের সমকালীন নগর-কেন্দ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। বৃহৎ জন-সমাজের সামনে তাঁরা নিজেদের চিন্তার ফসল নিয়ে এলেন। বৃহৎ জন-সমাজের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশ তাকে কমবেশি স্বাগত জানালেন। কিন্তু বড় অংশ? তেমন পছন্দ করলেন না। আর্থিক সচ্ছলতা এল না বলেই হয়তো এখানকার চলচ্চিত্র জগতে এল নতুন ঢেউ। 'ফোক'। বড় অংশ পছন্দ করলেন। মনোকষ্টে ভুগলেন ক্ষুদ্র অংশ। এই উদাহরণ আমি দিলাম আমার বক্তব্যকে কিছুটা পরিষ্কার করার জন্যেই। চলচ্চিত্রের সাফল্য-অসফল্যের বিচার বিশ্লেষণের জন্য মোটেই নয়। তাছাড়া এই উদাহরণে অন্যান্য পরিচালকদের আরও ছবির উল্লেখও অবশ্যই করা যেত। আমাদের এখানকার নাটকের ক্ষেত্রেও এমনি এক পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আমাদের প্রকাশিত নাটকের কথায় এলে হয়তো সেসব নাটককে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এক, সাহিত্য-মূল্যমণ্ডিত নাটক। দুই, জনপ্রিয় নাটক। জনপ্রিয় নাটকে সাহিত্য-মূল্য একেবারেই নেই, একথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। সম্প্রতি জনপ্রিয় নাটক যাঁরা রচনা করেছেন, তাঁরা নিজেদের সাধ্য ও মেধা অনুযায়ী দেশের এক বিরাট চাহিদাই পূরণ করেছেন। কল্যাণ মিত্র, আলী মনসুর, প্রসাদ বিশ্বাস, ফররুখ শিয়র প্রমুখ জনপ্রীতিধন্য নাট্যকারেরা দেশের সর্বত্র নাট্যানুষ্ঠানকে আজও বাঁচিয়ে রেখেছেন। নাট্য রচনার নিয়ম-নীতি যথারীতি পালিত না হলেও সব কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে, এমন তো কোন কথা নেই। বৃহৎ জন-সমাজকে যখন 'চিকন ভাত চিকন কাপড়' দিয়ে পরম তৃপ্তি দেওয়া এখনো সম্ভব হচ্ছে না, তখন যাঁরা তাঁদের জন্যে 'মোটা ভাত মোটা কাপড়ের' ব্যবস্থা করতে চাইলেন, তাঁরা কি শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদের পাত্র নন? ভুলে গেলে চলবে কেন যে, মঞ্চসাফল্য ও দর্শকের মনোরঞ্জন নাটকের সাহিত্য-মূল্যের মতই এক অতি প্রধান ও সবচেয়ে বড় দাবী। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শরাফতী স্বীকৃত সত্য। কিন্তু আধুনিক গানের প্রয়োগ ও আকর্ষণও তো সবাই স্বীকার করি।

প্রথম পর্যায়ের যে-জাতীয় নাটকের কথা বলা হয়েছে, সে-পর্যায়ে আমাদের কোন কোন নাট্যকার ও নাটকের কিছুটা পর্যালোচনা করাই এ প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। আধুনিক নাটক বলতে আমরা যা বুঝি তার সৃষ্টির উপর প্রভাব আছে পাশ্চাত্যের। পাশ্চাত্যের রেনেসাঁর বেগবতী

www.pathagar.com

ধারার যে স্রোতাংশ উনিশ শতকে বাংলা দেশের মাটিকে রসসিক্ত করেছিল, তারই এক অবদান হিসাবে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ। সেই বিকাশের স্বরূপ বিশ্লেষণ এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের সমকালীন সাহিত্য-মূল্যমণ্ডিত নাটক সামগ্রিক সাহিত্য ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে আরম্ভ করেছে কিনা। আমাদের বিশ্বাস, আরম্ভ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত নিজেদের বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ পথকে নিজের পথ বলে বেছে নিয়েছেন আমাদের অধিকাংশ নাট্যকারই। মতে ভিন্নতা হয়তো আছে তাঁদের। রোদ-ঝরা পথের ভীতিও হয়তো ঘাবড়ে দেয় কাউকে। পথ-প্রান্তের বৃক্ষছায়াও যে কাউকে টেনে নেয় না, তা নয়। কিন্তু মোটামুটি-ভাবে নাট্যকারের কাফেলাও আজ সামগ্রিক কাফেলায় সামিল। আধুনিক কালের নাটকের প্রথম পর্যায়ের যে উল্লেখ করা হয়েছে, তা যাঁদের অবদানে কলেবর পেতে আরম্ভ হয়েছে তাঁরা হলেন নূরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্, শওকত ওসমান, সিকান্দার আবু জাফর, ওবায়দুল হক, আলী মনসুর, আনিস চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল হক, রাজিয়া খান প্রমুখ নাট্যকার। এঁদের নাটক আলোচনার দাবীদার এজন্য যে, আমাদের সাম্প্রতিক নাট্য সাহিত্যের ধারা-বিবর্তনের সঙ্গে এঁরা জড়িত রয়েছেন। নাটককে সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করার ব্রতে এঁরা সচেষ্ট। সাতচল্লিশ-পূর্ব কাল থেকে আরম্ভ করে সাতচল্লিশোত্তর কালের কিছুটা সময় যে সব শ্রদ্ধেয় প্রবীণ সাহিত্যিক নাটক রচনা করেছেন, আমাদের এ আলোচনা ততটুকু ব্যাপক নয় বলেই তাঁদেরকে আর টেনে আনছি না। মীর মোশারফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, শাহাদাৎ হোসেন, ইব্রাহিম খান, আকবর উদ্দিন এবং আরও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক আমাদের পথিকৃৎ। তাঁদের প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা অতি আধুনিক কালে এসে যাচ্ছি।

নাটক রচনার ক্ষেত্রে সাতচল্লিশ-পূর্ব এবং সাতচল্লিশ-উত্তর দুই কালের, মধ্যে যিনি সেতুবন্ধ রচনা করেছেন বলা যায়, তিনি নাট্যকার নূরুল মোমেন। অধ্যাপক নূরুল মোমেনের 'নেমেসিস,' 'রূপান্তর,' 'নয়া খান্দান,' 'যদি এমন হোত' যথেষ্ট পঠিত নাটক। এবং বেশ পরিমাণে অভিনীতও। এককালে তাঁর 'নেমেসিস' বাংলা নাট্য সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এক চোরাচালানীর মনোবৈকল্য ও তার পরিণতি এ নাটকে কেন্দ্রীয় বিষয়। রচনার অভিনবত্ব, সংলাপের কৌশল ও একক চরিত্রের উপর নির্ভরতাই বিশেষ করে সে আলোড়ন সৃষ্টির মূলে। বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির প্রশংসাধন্য 'নেমেসিস' আমাদের

www.pathagar.com

নাট্যসাহিত্যের এক বিশেষ অবদান। মোমেন সাহেবের পরবর্তী নাটক 'রূপান্তর' হাল্কা ধরনের নাটক হলেও তার সংলাপ পাঠক ও দর্শককে চমৎকৃত করে। অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের কথায় "নূরুল মোমেন তাঁর নয়া খান্দানে নতুন খান্দানের বিশ্লেষণ করেছেন, যার মূল কথা হল শিক্ষা ও আধুনিক জীবন-বোধই হল খান্দানের ভিত্তি, পুরাতন বংশগৌরব যার ক্ষীণপ্রভ।" অধ্যাপক ইসলামের কথার আবার বলা যায়, "নূরুল মোমেন সাধারণত তাঁর নাটকে আমাদের জীবনের এমন একটি দিককে প্রাধান্য দেন যা হয়তো অন্যান্য নাট্যকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।··· তাঁর প্রতিটি নাটকেই এমন একটি সমস্যা বা সংঘাত থাকে উপজীব্য হয় যা হয়তো অন্য নাট্যকারদের কাছে সমস্যা বলেই প্রতীয়মান হয় না। তাঁর প্রতিটি নাটকেই এমন এক একটি সমস্যা বা সংঘাত, বিচিত্র চরিত্র তাদের বিচিত্রতর কৌতুকময় উইটধর্মী সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। নূরুল মোমেনের নাটকগুলি সাধারণত মিলনধর্মী এবং তাঁর নাটকে আগাগোড়া একটা হাস্য-কৌতুক, একটা আনন্দময় পরিবেশ ব্যাপ্ত থাকে।"

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী সাতচল্লিশোত্তর কালের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকার। এবং ইদানীং নাট্য আসরে তাঁর কণ্ঠস্বর বিশেষভাবে উচ্চকিত। চৌধুরী সাহেব সমাজ সচেতন শিল্পী। সামাজিক অনাচার-অত্যাচার, জীবনের অসহায় হাহুতাশ এক সময় শিল্পীকে চঞ্চল করে তুলেছিল। সে-চাঞ্চল্যের প্রকাশ, জীবনের অসঙ্গতির প্রতি বিদ্রোহ তাঁর সেদিনের রচনাসমূহে সুস্পষ্ট। তারপর হয়তো স্বাভাবিকভাবেই জীবনে এসেছে স্থৈর্য, চিন্তায় এসেছে বুদ্ধির বাস্তবতা এবং শিল্প-ধারণায় এসেছে গভীরতা। পরবর্তী রচনাসমূহে তার প্রমাণের অভাব মিলবে না। মুনীর চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর,' দ্বিতীয় নাটক 'চিঠি' এবং তারপর 'কবর' ও 'দণ্ডকারণ্য' নামে দুটি নাটিকা সংকলন। তবে কবরের তিনটি নাটিকা 'মানুষ' 'নষ্টছেলে' ও 'কবর' প্রথম দিককার রচনা। 'কবরের' তিনটি নাটিকাই তৎকালীন ঘটনার উপর রচিত। আর এসব ক্ষেত্রেই রচনা নিতান্ত সাময়িক ও প্রচারধর্মী হয়ে ওঠার ঝক্কির সম্মুখীন হয়। কিন্তু চৌধুরী সাহেব সমসাময়িক পরিস্থিতিকে পশ্চাৎ-পট হিসাবে ব্যবহার করে তাঁর রচনাকে শিল্পের সত্যে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। আলাউদ্দিন আল-আজাদের কথায় "অতি নিকটকে দূরত্বের মধ্যে বিন্দুতে স্থাপন করবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় কবর নাট্যাবলী উত্তীর্ণ হয়েছে"। দণ্ডকারণ্যে 'কবরে'র শিল্পরীতিরই সম্প্রসারণ দেখতে পাওয়া যাবে। চৌধুরী সাহেবের 'রক্তাক্ত প্রান্তর' তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক ঘটনার উপর রচিত। চৌধুরীর মানস পরিচয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের যে উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এবং 'চিঠি' তাঁর সেই পর্যায়ের রচনা। জীবনের শান্তি নষ্টকারী যে যুদ্ধ, তাকে নাট্যকার ঘৃণা করেছেন। মারাঠা ও মুসলমানের রক্তে পানিপথের প্রান্তর রক্তাক্ত হয়ে গেল, এতেই শুধু নাট্যকারের মন আর্তনাদ করে ওঠে নি; দুনিয়ার কোন প্রান্তরই আর রক্তাক্ত হয়ে না উঠুক, নাট্যকারের এ কামনাও স্পষ্ট। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' চিরাচরিত নাট্য-রীতি অনুযায়ী মুনীর চৌধুরীর সার্থক প্রয়াস। তর্ক সাপেক্ষ হলেও এ নাটকের সংলাপ, গতি ও কাহিনী মোটামুটি সুন্দর। তাঁর 'চিঠি'কে উল্লেখযোগ্য নাটক বলতে কারও দ্বিধা থাকলেও তাকে ভাল একটা সামাজিক নাটক বলা যায়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের কেন্দ্র করে নানা অনুশাসন, খেয়াল ও ত্রুটিনাটিজনিত ঘটনাচক্র এ নাটকের উপজীব্য।

ঘটনার গ্রন্থি মোচন করে তার মাধ্যমে চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করাই উচ্চমান নাটকের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন। এটা একটা কৌশল। সজ্ঞান বুদ্ধিদীপ্ত চমৎকারিত্ব এ কৌশলকে মর্যাদায় মণ্ডিত করে। আর এ কৌশল যাঁর যত আয়ত্ত তিনি অন্তত তত বড় নাট্য-সাহিত্যিক। অধ্যাপক চৌধুরী এ বিষয়ে কুশলী শিল্পী।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। সুসাহিত্যিক হিসাবে তিনি বহুকাল থেকেই এদেশে সুপরিচিত। কিন্তু নাট্যকার হিসাকে তাঁকে পেয়েছি আমরা সম্প্রতিকালে। 'বহিপীর' নাটক লেখার পর। আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ও আনন্দে মন ভরে গেছে তাঁর নাট্য-বোধ ও কৌশল লক্ষ্য করে। আমাদের সমাজের সনাতন সংস্কারসমূহের হৃদয়হীনতা এবং তারই পেষণে মানুষের আর্তনাদ, সামাজিক জীবনের অসামঞ্জস্য অবিচার ও তজ্জনিত হাহাকার আমরা শুনতে পাই তাঁর 'বহিপীর' ও 'তরঙ্গভঙ্গ' থেকে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লা'র 'বহিপীর' প্রচলিত নাট্য প্রকরণে রচিত নয়। রচনাশৈলীর দিক থেকে 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটক তো সম্পূর্ণভাবে নতুন। 'বহিপীর' নাটকে প্রাচীন ও নতুন জীবন-বোধের সংঘাত উপভোগ্য নাটকীয় আবর্তের সৃষ্টি করেছে। নাটকের পরিণামে যে সামাজিক পরিবর্তনের রায় দিয়েছেন নাট্যকার, তাতে রয়েছে সমাজ-বিজ্ঞানের অমোঘতা। 'বহিপীর' প্রধানত গ্রাম্য জীবনের নাটক। কিন্তু আধুনিক নাট্যকারকে আমরা তাতে দেখতে পাই। 'বহিপীরের' নাট্যকারের আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, 'বহিপীরে' তিনি উগ্র জ্বালাময়ী নন। সামাজিক আবর্তে পতিত একাল ও সেকালের মানুষদের চরিত্র এঁকেছেন তিনি সহানুভূতির সঙ্গে। সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটাই সেখানে

www.pathagar.com

প্রধান। একাল বা সেকালের চরিত্রগুলি সেই প্রক্রিয়া প্রকাশের প্রয়োজনে এসেছে। 'তরঙ্গভঙ্গে' অবিশ্যি নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্রসমূহ আরও উগ্রতায় মুখর। 'তরঙ্গভঙ্গে'র কোন গতানুগতিক কাহিনী নেই। চরিত্রগুলিও তাই নির্দিষ্টভাবে নির্মিত হয় নি। এ নাটককে অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য ও অর্থহীন মনে হতে পারে। তবে সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানের মধ্য থেকে দর্শক মনে যে প্রভাব সৃষ্টি হবে, তাতেই সিদ্ধ হয়ে উঠবে নাটকের উদ্দেশ্য।

শওকত ওসমান আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুসাহিত্যিক। কথাশিল্পী। যথেষ্ট তীক্ষ্ম সংলাপে তাঁর চরিত্রেরা যখন নিজেদের হাজির করে, তখন আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না 'তস্কর ও লস্কর' 'আমলার মামলা' ও 'কাঁকর মনি'র নাট্যকার আগামী দিনে সুন্দর পৃথিবী রচনার উদ্দেশ্যে কত চঞ্চল অভিলাষী! বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অবক্ষয়, সমাজ-জীবনের ও সমাজ-বিশ্বাসের কুসংস্কার এবং তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা অহংকার ও দাম্ভিকতায় যেভাবে জীবন কন্টকাকীর্ণ— তারই বিভিন্ন সার্থক প্রকাশ দেখতে পাই তাঁর বিভিন্ন নাটকে। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' আমাদের নাট্য সাহিত্যে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। শক্তি-ঐশ্বর্যের ফলে মানুষকে ক্রীতদাস বানানো যায়, তার সব কিছুই কেনা যায়। কিন্তু কেনা যায় না হাসি। কেনা যায় না ভালবাসা।

'মানচিত্র' ও 'এ্যালবামে'র নাট্যকার আনিস চৌধুরী উপরোক্ত নাট্যকারদের তুলনায় বয়সে তরুণ হলেও নাটক রচনার শক্তিমত্তায় মোটেই তরুণ নন। এ-কথার প্রমাণ মিলবে তাঁর 'এ্যালবাম' থেকে। এর কাহিনী সামাজিক জীবনের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে। নাগরিক জীবন বিধৃত 'এ্যালবামে'র কাহিনী নির্মাণে আমরা নতুনত্বের সন্ধান পাই। শব্দচয়ন এ নাটকের উল্লেখযোগ্য দিক। সংলাপের গতি শ্লথ হয়ে মাঝে মাঝে দর্শকদের মনের উপর আঘাত করতে পারে একথা যতই সত্য হোক না কেন, তা কখনো পীড়িত করে না। দেশের নাট্যামোদীরা আনিস চৌধুরীর কাছ থেকে আরও অনেক নাটক আশা করবেন, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সিকান্দার আবু জাফর কবি। সম্প্রতি নাট্যকারও। রোমান্টিক স্বভাবী হয়েও বাস্তব সুন্দর সংলাপে বিধৃত করেছেন তার 'শকুন্ত উপাখ্যান' নাটককে। জাফর সাহেবের দ্বিতীয় নাটক 'সিরাজউদ্দৌলা'। গিরিশ ঘোষ ও শচীন সেনগুপ্ত সিরাজউদ্দৌলাকে এদেশে বাঁচিয়ে রেখেছেন ইতিহাসের চেয়েও বেশি করে। বিশেষ করে শচীন সেনগুপ্ত। তবে তাঁদের সিরাজ কিছুটা ভীরু ও অপদার্থ হয়েই যেন ফুটে উঠেছে। কিন্তু সিকান্দার আবু জাফর সিরাজ চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁর মানবিকতা ও আদর্শবোধের

www.pathagar.com

প্রেরণায়। সিরাজ চরিত্রে আদর্শ ও ভালবাসার জয় উল্লেখযোগ্য। জানি, ইতিহাস আর সাহিত্য এক নয়। সাহিত্যিক ঐতিহাসিকের শিষ্য হয়ে গুরুপূজা করবেন, এ-কথা স্বীকৃতব্য নয়। ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন যাঁরা, তাঁরা সে চরিত্রকে নিজেদের ধ্যান ধারণা দিয়েই সৃষ্টি করবেন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্যিককে মনোময়তার আশ্রয় নিতে হবে। অন্য কথায়, সাহিত্যিকের মানস-পরিচয় ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটবে সেই চরিত্র চিত্রণে। কাজেই বলা যায়, সিকান্দার আবু-জাফরের মানবিকতা ও আদর্শবোধই সিরাজকে তেমনি করে রূপায়িত করেছে। নাট্যকারের পরবর্তী নাটক 'মহাকবি আলাউল'-এর নাট্য সার্থকতা সম্পর্কে মতান্তর থাকলেও তার আদর্শগত সাহিত্য-মূল্যকে অস্বীকার করা চলবে না।

আমাদের এ আলোচনা বলতে গেলে অসমাপ্ত। পরিশেষে আরও একটা নিবেদন করব। তা হচ্ছেঃ এ পর্যন্ত নাটক ও নাট্যকারদের সম্পর্কে যে সব বক্তব্যের অবতারণা করা হয়েছে তা আলোচনার শুক্লপক্ষ। তার কৃষ্ণপক্ষও যে নেই, তা নয়।

এতক্ষণ সহকর্মী প্রথিতযশা নাট্যকারদের কারও কারও আলোচনা করা হল। আমার নাটক সম্পর্কে স্বাভাবিক কারণেই কিছু বলা হয় নি। তাই আমার সম্পর্কে বিভিন্ন সাহিত্য-পন্ডিতদের দু'টি মন্তব্য এখানে তুলে ধরে কিছুটা আত্মপ্রসাদ পাওয়ার চেষ্টা করছি।

"Askar Ibne Shaikh is the most prolific of the younger generation of dramatists.....He is by far the most popular of our play-wrights." (Bengali Literature in East Pakistan, written by Mr. Enamul Karim and revised by Dr. Syed Sajjad Husain and Mr. Serajul Islam Choudhury, The Information Department, Government of East Pakistan, EPGP 62/63, P. 14)

"আসকার ইবনে শাইখ সম্ভবত একমাত্র নাট্যকার যিনি কেবলমাত্র নাটক রচনা করেন ; এবং নাটকের সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়েও তিনি প্রথম।...আসকার ইবনে শাইখের প্রবলতম আগ্রহ হচ্ছে বাংলাদেশের সমাজ, ইতিহাস, আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দকে নাট্যরূপে পরিদৃশ্যমান করা। এ সত্য তাঁর সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় ধারার নাটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, পৃঃ ৪৭৪, ১৯৬৯)।

www.pathagar.com

লেখকের কতিপয় নাটক

বিরোধ

পদক্ষেপ

বিদ্রোহী পদ্মা

অনুবর্তন

প্রচ্ছদপট

অগ্নিগিরি

তিতুমীর

অনেক তারার হাতছানি

রক্তপদ্ম

শেষ অধ্যায়

লালন ফকীর

কর্ডোভার আগে

রাজপুত্র

প্রতিধ্বনি

মহাবিজয়

এবং

১১টি ঐতিহাসিক নাটকের সংকলন

মেঘলা রাতের তারা

১৪টি ঐতিহাসিক নাটকের সংকলন

রাজ্য রাজা রাজধানী

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
এক/দৃষ্টান্ত	১৭
দুই/অনুকরণ	২৪
তিন/অনুসরণ	৩০
চার/সাধারণ রঙ্গালয়ের পথে	৩৭
পাঁচ/স্থায়িত্বশীল সাধারণ রঙ্গালয়	৪৩
ছয়/পরিচয় সন্ধানে বাংলা নাট্যকৃতি	৪৯
সাত/বাংলা নাট্যকৃতির প্রতিষ্ঠিত রূপ	৫৬
আট/রেনেসাঁ নয়, পুনরুজ্জীবন	৬৪
নয়/বাংলা মঞ্চ-নাট্যে যুগে যুগে পক্ষ-প্রতিপক্ষ	৭১
দশ/আমাদের নাট্য-অভিজ্ঞতা ও নাট্য-সংস্কার	৮০
এগারো/সাতচল্লিশোত্তর আমাদের মঞ্চ-নাট্য	৯৫
বারো/পরিশিষ্ট ঃ যাত্রা ও নাটক	১১৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক/দৃষ্টান্ত

এটা সুবিদিত যে, বাংলা ভাষায় মঞ্চ-নাটকের অভিনয়ের জন্য এতদ্দেশে পাশ্চাত্য ধরনের প্রথম রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করা হয় ১৭৯৫ সালে, কলকাতার ডোম-তলায়। হেরাশিম লেবেডেফ নামক এক রুশদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞ-পন্ডিত ব্যক্তি এর নির্মাণকর্তা। সেই মঞ্চে বাংলায় অনূদিত The Disguise নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ১৭৯৫ সালের ২৭শে নবেম্বর, দ্বিতীয় অভিনয় ১৭৯৬ সালের ২১শে মার্চ। অনূদিত নাটকের বাংলা শিরোনাম ছিল অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর মতে 'কাল্পনিক' (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃঃ ৬৯)এবং অধ্যাপক পি.গুহ ঠাকুর-তার মতে 'ছদ্মবেশ' (The Bengali Drama, London 1930, P. 44) তারপরই ওই থিয়েটার বন্ধ করে দিয়ে লেবেডেফ এদেশ ত্যাগ করে যান। এ ঘটনার পর ৩৬ বছরেরও অধিককাল ধরে এ জাতীয় কোন নাট্য-প্রয়াসের তথ্য পাওয়া যায় না।

নিঃসন্দেহে এই নাট্য মঞ্চায়ন ছিল এতদ্দেশে অভিনয়ানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি ও শিল্পরীতি অনুসারী আধুনিকতার এক অনন্য সূত্রপাত। কলকাতার বাঙ্গালীদের জন্য এক ঝলক নতুন দৃষ্টান্ত। এদেশীয় পুরুষ ও নারী শিল্পী সমন্বয়ে অভিনীত এবং অতি-উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে প্রদর্শিত পুরোপুরি পাশ্চাত্য ছাঁচে গড়া এই নাট্যানুষ্ঠানের সাফল্যও ছিল আশাতীত। প্রায় দু'শো আসনের এই রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনয়ে টিকেটের মূল্য ছিল ৪ টাকা ও ৮ টাকা এবং দ্বিতীয় অভিনয়ে ১ মোহর (বঙ্গীয় নাট্যশালা, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬১, পৃঃ ৩)। তবুও এমনি সফল প্রয়াসের অবসান ঘটিয়ে লেবেডেফ চলে গেলেন কেন ? এবং এই সফল প্রয়াসের অনুকরণে-অনুসরণে প্রায় ৩৬ বছরের মধ্যে ওই কলকাতায়ই এমনি আর কোন নাট্য-প্রয়াসের খবর নেই কেন ? এসব প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের সন্ধানে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে তখনকার সাংস্কৃতিক তথা রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির উপর।

www.pathagar.com

১৭৫৭ সালে পলাশী বিপর্যয়ের পর এদেশে ইংরেজ আধিপত্যে এবং ইংরেজী ভাষার প্রচলনে যে পরিবর্তনের ঢল নামল, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তা যতটা না বৈপ্লবিক ছিল তার চাইতে বেশী বৈপ্লবিক ছিল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের কথায় ঃ

"We cannot describe the great change better than by stating that English conquest and English education may be supposed to have removed Bengal from the moral atmosphere of Asia to that of Europe." (The Literature of Bengal, 1877, p. 169)। তবে ঐতিহাসিক দত্তের এ-মন্তব্য কলকাতা-কেন্দ্রিক নবালোকপ্রাপ্তদের বেলাতেই বেশী প্রযোজ্য। তাদের বেলায় প্রথম কিছুকাল চলে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। তারপর আসে নতুনতর অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা। ক্রমে তারা জাতীয় অতীতকে বর্তমানের সংলগ্ন করে নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক সম্ভাব্য ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবে ইউরোপীয় চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা আত্মস্থ করার পাশাপাশি তারা সচেতন হয়ে ওঠেন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি। এই নবচেতনার প্রতিফলন দেখা যায় যেমন সাহিত্যে তেমনি নাট্য-প্রচেষ্টায়ও। ১৭৬০ সালে কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সাহিত্য ক্ষেত্রে যে নব-পর্যায়ের শুরু, ১৮৩০ সালে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকরের' প্রথম প্রকাশের সময়টায় তার অস্তিত্ব দৃশ্যমান এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে তার মুখর অস্তিত্ব প্রশ্নাতীত।

ইতিমধ্যে ১৮০০ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং গঠিত হয়েছে উইলিয়াম কেরীর শ্রীরামপুর মিশন। ১৮১৬ অথবা ১৮১৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু কলেজ। কেরীর অভিধানের শেষ খন্ড প্রকাশিত হয়েছে ১৮২৫ সালে। এসব ক্রিয়াকান্ডের মাধ্যমে এবং প্রভাবে বলতে গেলে এদেশে সূচিত হয়ে গেছে এক 'রেনেসাঁ'—যদিও তা নিঃসন্দেহে এক কলোনিয়্যাল রেনেসাঁ। ওই সময়ে অভাবনীয় উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে বাংলা গদ্য সাহিত্য। এই কাল-পরিধিতে বাংলা মঞ্চ-নাট্যের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশকে দৃষ্টান্ত, অনুকরণ ও অনুসরণের কাল হিসাবে বিভক্ত করা যায়। এই কালগুলোর কথাই আসবে আমাদের বক্ষ্যমান আলোচনায়।

এটা তো সবারই জানা যে ১৭৫৭ সালের আগেই কলকাতার পত্তন হয়েছিল। পত্তনের পরেই কলকাতায় আরম্ভ হয় ইংরেজদের বসবাস—প্রথমে কোম্পানির সৈন্যসামন্ত, পরে প্রশাসক ব্যবসায়ী মিশনারীর লোকজন ইত্যাদির দ্বারা। এইসব ইংরেজ নরনারী কলকাতায় থাকছে যখন তখন তাদের সংস্কৃতি অনুসারী আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজনও যে মাঝে-মধ্যে হবে তা ধরে নেয়া যায়। তদনুসারে

www.pathagar.com

অধ্যাপক গুহ ঠাকুরতার মতে (The Bengali Drama, p. 41) বাংলাদেশে প্রথম ইংলিশ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতার লালবাজার স্ট্রীটে ১৭৫৬ সালে। ১৭৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ক্যালকাটা থিয়েটার'; এবং ১৭৮৭ সালে 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' ইংরেজেরা তাদের প্রথামত আনন্দ উপভোগের জন্য গড়ে তোলে। এসব থিয়েটার ছিল কনসার্ট হল; নিছক নিজেদের জন্যই।

'ক্যালকাটা থিয়েটার' নির্মিত হয়েছিল তখনকার দিনেই প্রায় এক লাখ টাকা খরচা করে। টাকাটা উঠেছিল ইংরেজদের মধ্যে ১০০ টাকার শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে। ওয়ারেন হেস্টিংস, চীফ জাস্টিস এলিজা ইম্‌পে এবং জেনারেল মনসন ছিলেন শেয়ার ক্রেতাদের অন্যতম। ওই থিয়েটারে বিভিন্ন সময়ে অভিনীত হয় The Comedy of Beaux Stratagem, The Comedy of Errors, Mahomet, Citizen, Hamlet, Richard III প্রভৃতি নাটক। 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' কে তখন মিসেস 'বিণ্টোস্‌ থিয়েটার' নামেও অভিহিত করা হত। ওই মিসেস ছিলেন মিষ্টার বিণ্টো নামে এক বণিকের স্ত্রী, অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শিনী। বলা যায়, তারই উদ্যোগে 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র প্রতিদ্বন্দী হিসাবে গড়ে ওঠে 'চৌরঙ্গী থিয়েটার'। এখানে অভিনয় হত নারী-পুরুষ সমন্বয়ে এবং এর দেখাদেখি 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'ও অভিনেত্রীর অংশগ্রহণের রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

সময়ের এই প্রেক্ষাপটেই ১৭৯৫ সালে স্থাপিত হয় লেবেডেফের রঙ্গমঞ্চ। আবার ১৭৯৬ সালের ২১শে মার্চের পরেই লেবেডেফের থিয়েটার উঠেও যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন? তারই আলোচনায় আসছি। লেবেডেফ তো চলে গেলেন। নিজ দেশে ফেরার পথে লন্ডনে থাকলেন কিছুদিন। সেখানে তাঁর রচিত হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হল ১৮০১ সালে। ওই বছরেই রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে তিনি এক প্রেস কিনে বাংলা অক্ষর খোদাই করান। ১৮০৫ সালে ওই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় তাঁরই রচিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিবরণ। তাতে তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম, পুরাণ গ্রন্থ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এসব নানা বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট করেন।

উল্লেখ্য যে, লেবেডেফ ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ। ১৭৮৫ সালের ১৫ই আগষ্ট তিনি ভারতবর্ষে আসেন। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর কথায়, "সেকালে যে সকল ইউরোপীয় এখানে আসিত সাধারণতঃ তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের অর্থলুণ্ঠন, কিন্তু লেবেডেফ আসিয়াছিলেন ভারতীয় ভাষা ও দর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিতে। তিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজে উপস্থিত হন ও প্রথমে তামিল ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং সঙ্গীত অনুষ্ঠানাদি করিয়া তিনি তাঁহার এখানকার ব্যয়

www.pathagar.com

নির্বাহ করিতেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়া পরে তিনি রাজধানী কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এখানে দুই বৎসর চেষ্টার পর অবশেষে তিনি এক উপযুক্ত শিক্ষক লাভ করেন। এই শিক্ষকের নাম গোলোকনাথ দাস। তিনি তাহার নিকট বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং তাহার পরিবর্তে তাঁহাকে ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ্যা শেখান। সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তিনি আমাদের বেদ, বেদান্ত দর্শন, পুরাণ, কাব্য, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেন এবং এই-রূপে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন। বাংলা ভাষা তিনি এত সুন্দররূপে শিখিয়াছিলেন যে, The Disguise এবং Love Is the Best Doctor নামক নাকটদ্বয়ের অতি চমৎকার অনুবাদ তিনি করিয়াছিলেন।" (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃঃ ৬৮–৬৯)।

এবার লেবেডেফের 'হিন্দুস্থানী ব্যাকরণ' গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর নাট্য-প্রচেষ্টার যে বিবরণ দিয়েছেন, তার থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি : "(ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে) এই সকল গবেষণার পর আমি The Disguise ও Love Is the Best Doctor নামে দুই খানা ইংরেজী নাটক বাংলাতে অনুবাদ করি। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, এদেশীয়রা গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা—সে যতই বিশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হউক না কেন—অনুকরণ ও হাসি-তামাশা বেশী পছন্দ করে। সেই জন্য আমি চৌকিদার, চোর, উকিল, গোমস্তা ইত্যাদি চরিত্রে পরিপূর্ণ এই দুইখানি নাটকই নির্বাচন করিয়াছিলাম।... আমার ভাষা শিক্ষক গোলোকনাথ দাস আমার নিকট এক প্রস্তাব করিলেন যে, যদি আমি এই নাটক সর্বসমক্ষে অভিনয় করিতে প্রস্তুত থাকি, তবে তিনি আমাকে এদেশী অভিনেতা ও অভিনেত্রী আনিয়া দিতে পারেন। তাঁহার এই প্রস্তাবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং ইউরোপীয়দিগের চিত্তবিনোদনের জন্য আমার নাট্যশালার সংকল্প অবিলম্বে সফল করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণর জেনারেল স্যার জন শোরের নিকট যথারীতি লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিলাম। তিনিও বিনা দ্বিধায় তাহা মঞ্জুর করিলেন।" (বঙ্গীয় নাট্যশালা, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উদ্ধৃত, পৃঃ ১)।

লেবেডেফ থিয়েটার বন্ধ করে এদেশ থেকে চলে গেলেন কেন তার হদিস সন্ধানের আগে এখানে উল্লেখ করে নেয়া উচিত যে, এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল রুচি-মতামত-নীতিবোধ ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এদেশীয়দের 'খাঁটি ইংরেজ' বানানো। এদেশের মহৎ একটা কল্যাণ কামনায় ইংরেজেরা এদেশীয়দের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায়নি।

www.pathagar.com

কলকাতায় ইংরেজদের নাট্যানুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট ও উপরের দু'টি সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্তে বোধ হয় আসা যায় ঃ

(১) কলকাতায় ইংরেজদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি থিয়েটারের মতই লেবেডেফের থিয়েটারও ছিল আর একটি সংযোজনমাত্র। পার্থক্য শুধু— লেবেডেফ ইংরেজী নাটকের বাংলা অনুবাদ করে তা মঞ্চস্থ করেছিলেন।

(২) ইউরোপীয়দিগের চিত্তবিনোদনের জন্য লেবেডেফ নাট্যশালা স্থাপনের সংকল্প করেছিলেন।

(৩) এদেশীয়রা, লেবেডেফের ধারণায়, গম্ভীর উপদেশমূলক কথা অপেক্ষা অনুকরণ ও হাসি-তামাশাই বেশী পছন্দ করে বলেই চৌকিদার, চোর, উকিল প্রভৃতি হালকা চরিত্রপূর্ণ ওই দু'টি নাটকের অনুবাদ করেছিলেন।

(৪) ওই নাটক অভিনয় করানোর জন্য গোলোকনাথ দাসের প্রস্তাব তিনি সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন।

(৫) টিকেটের অতি-উচ্চ মূল্য সত্ত্বেও অভিনয়ানুষ্ঠান প্রচুর দর্শক সমাগমে আশাতীত সাফল্য লাভ করেছিল, যেমনটি হয়তো ইংরেজদের নাটকের বেলায় হত না।

যদি ধরে নিই, লেবেডেফ ছিলেন নিছক জ্ঞানপিপাসু এক প্রতিভাবান খেয়ালী শিল্পী এবং তিনি ইংরেজ প্রশাসকদের ঔপনিবেশিক পলিসির মার-প্যাঁচ ঠিকমত আঁচ করতে পারেননি, তাহলে উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে এটা আন্দাজ করা যায় যে লেবেডেফের থিয়েটার-প্রকল্পটা এদেশের জন্য কল্যাণমুখী ছিল বিধায় ইংরেজ প্রশাসকরা লেবেডেফকে ওকাজে আর অগ্রসর হতে দিতে চাননি। লেবেডেফ সম্পর্কে আরও বলা যায়, নাটকের পিছনে তিনি আগেও লেগে থাকেননি, পরেও না। এদেশে এসেছিলেন, জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ায় তাঁর উদ্দেশ্যের লাগসই নাটকের অনুবাদ করেছিলেন এবং তা মঞ্চস্থ করা সম্ভব জেনে পাশ্চাত্য ধরনের রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে সে নাটকের অভিনয়ও করিয়েছিলেন। তার-পর তাঁর গৃহীত কার্যক্রম চালিয়ে নেয়ার পথে যখন বাঁধা এলো অথবা তার খেয়াল অন্য পথে চালিত হল, তখন তিনি ঘরের পথে রওয়ানা দিলেন। কিন্তু রেখে গেলেন এদেশীয়দের জন্য এক ঝলক দৃষ্টান্ত, এক নতুন অভি-জ্ঞতা। দৃষ্টান্তটা হল ঃ পাশ্চাত্য ধরনের মঞ্চে বাংলা নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করা যায়। আর অভিজ্ঞতাটা হল ঃ বাংলা ভাষায় মঞ্চনাট্য হতে পারে উন্নতমানের অভিনয়ানুষ্ঠান।

যাদের কাছে এই দৃষ্টান্ত, যারা পেলেন এই অভিজ্ঞতা, তারা কারা ? কি তাদের আর্থ-সাংস্কৃতিক মানস পরিচয় ? সঙ্গে সঙ্গে তারা এই দৃষ্টান্ত ও অভি-

www.pathagar.com

জ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারলেন না কেন ? এর উত্তরের জন্য আবার ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। সে ইতিহাস রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সপক্ষে রাষ্ট্র বিপ্লব তখন হয়েই গেছে। রাজা বদলের পালা শেষ দৃশ্যে এসে গেছে। ১৭৭৪ সাল থেকেই কোম্পানি-ভারতের রাজধানী কলকাতা রূপৈশ্বর্যের আলো ছড়াচ্ছে। আর ক্ষয়রোগে ধুঁকছে তখন সুবে বাংলার পুরনো রাজধানী মুর্শিদাবাদ। তার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ-কেন্দ্রিক পুরনো সম্ভ্রান্ত অভিজাতেরাও। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে আমূল পরিবর্তন এসেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও। পুরনো বিত্তবানদের স্থলে গদীস্থ হয়েছেন নতুন বিত্তবানেরা। দেশে রাজস্ব আদায়কারীর হাত বদল হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় জমিদারী বন্দোবস্ত একসালা পাঁচশালা দশসালা করে করে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ীই হয়ে গেছে। রাজধানীর নতুন বড়লোকেরা অভিজাত হওয়ার সাধনায় রত। বিভিন্ন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বা 'হৌসে'র ব্যবসায়ী ও অংশীদারগণ, ইংরেজ বণিকের এজেন্টগণ, কোম্পানীর গোমস্তা মুৎসুদ্দী প্রভৃতি অনুগত বিত্তাভিলাষীরাই তখন নতুন রাজধানীর 'এলিট' (elite)। উঁচু প্রাসাদের প্রসাদসৃষ্ট বলে এবং এদেশের জন্য সম্পূর্ণ অভিনব এক অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস থেকে উদভূত বলে এসব 'এলিটরা' দেশের মাটি ও মানুষের কাছ থেকে তখনও বিচ্ছিন্ন।

রাজনৈতিক প্রয়োজনেই এই শ্রেণীটির সৃষ্টি। কার্ল মার্কসের কথায় "ভারতবর্ষে এক দ্বিবিধ কর্তব্য পালন করতে হবে ইংলণ্ডকে ঃ একটি ধ্বংসমূলক এবং অন্যটি উজ্জীবনমূলক—পুরাতন এশীয় সমাজের ধ্বংস এবং এশিয়ায় পাশ্চাত্য সমাজের বৈষয়িক ভিত্তির প্রতিষ্ঠা।" (ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল, ১৮৫৩, প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭—১৮৫৯, পৃঃ ৩৩)। এই দ্বিবিধ কর্তব্য পালনের কর্মকাণ্ড চলছিল তখন। এদেশে বৃটিশদের বৈষয়িক ভিত্তির খুঁটি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল ওইসব 'এলিটরা'। "সতেরোশো সাতান্নর পর ইংরেজ জাতি যখন এদেশের মালিক-মোক্তার হয়ে ওঠে, তখন ইংরেজদের সামাজিক গরজে এদেশীয় বশংবদ বর্ণ হিন্দুদের নিয়ে নূতন ভূস্বামী, নূতন বণিক শ্রেণী ও নূতন বুদ্ধিজীবিদের সৃষ্টি করে, এবং তারাই মধ্যবিত্ত সমাজ হিসেবে ব্রিটিশের অনুগ্রহে পরিপুষ্টিলাভ করতে থাকে।" (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সাংস্কৃতিক রূপান্তর, আবদুল মওদুদ ১৯৬৯, পৃঃ ৯৯)। ডক্টর বি. বি. মিশ্রের মতে, স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় পুরাতন সমাজদেহের মধ্য থেকে পাশ্চাত্য জগতের মত বাংলা তথা ভারতীয় হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব ঘটেনি। এ জন্যেই সামাজিক প্রয়োজনে সৃষ্ট এদেশীয়

www.pathagar.com

মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুকারীর ভূমিকাই পালন করেছে। (The Indian Middle Class : Their Growth, p. 11)। সংস্কৃতিতে তারা তখন পরাশ্রয়ী, মৌলিক চিন্তায় দুর্বল।

অর্থে-বিত্তে কলকাতা ফেঁপে উঠতে থাকলেও বাংলার সাধারণ মানুষ আঠার শতকের শেষেও ১৭৭০ সালের 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে'র ধকল কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কলকাতার নব-সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কোন সুযোগই তাদের ছিল না। তাদের কাছে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ড বলতে তখনও যাত্রা, পাঁচালী, কবি, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি। কলকাতার 'বাবুরা' তাদের কাছে 'ফিরিঙ্গির চেলা, অধার্মিক'।

এমনি রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে লেবেডেফের নাট্যানুষ্ঠানে দর্শক হয়ে এসেছিলেন কলকাতার সুজ্যমান মধ্যবিত্তেরা। স্মরণ আচার্যের কথায়, "তৎকালে বণিক সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে একদল ব্যক্তিত্বহীন বাঙ্গালী জীবিকা অর্জন করত। তারা এবং ইউরোপীয়রাই ছিলেন এই নাটকের দর্শক।... জনসাধারণের সঙ্গে এই অভিনয়ের কোন যোগাগোগ ঘটেছিল বলেও মনে হয় না।" (বাঙ্গালী ও তাহার নাট্য সংস্কার, দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৫, পৃঃ ২৩১)। নতুন দিনে অর্থবিত্ত যত তাড়াতাড়ি এদের হাতস্থ হয়েছে, শিক্ষা-সংস্কৃতি তত তাড়াতাড়ি ধাতস্থ হয়নি। নতুন দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছিল এদের সামনেই। এক নতুন অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পেয়েছিলেন এরাই।

লেবেডেফের ওই নাট্য-প্রয়াস ছিল অনেকাংশে অগ্র-সাময়িক। উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতের আগেই লেবেডেফ বীজ রোপন করেছিলেন। অগ্র-সাময়িক ছিল বলেই সেই বীজ থেকে চারা গজাল না। একটা বন্ধ্যা দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্যেই এই সফল নাট্যানুষ্ঠানের সার্থকতা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বহুদিন পর্যন্ত কোন অনুকরণ-অনুসরণ সম্ভব হল না। সম্ভব হল তখন এবং চারাও গজাল তখন, যখন তিন যুগেরও অধিককাল পরে প্রস্তুতকৃত ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তের বীজ আবার রোপন করা হল। সেটা ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় নিজগৃহে স্থাপিত রঙ্গমঞ্চে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের মঞ্চায়নের মাধ্যমে।

---

www.pathagar.com

দুই/অনুকরণ

নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে নির্মিত রঙ্গমঞ্চে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয়-কথার আগে আরও কিছু কথা বলে নিতে হবে। সে-কথা ইংরেজদের প্রচুর নাট্যাভিনয়ের কথা, এদেশীয় নব্য-শিক্ষিত ও বড়লোকদের অন্ধ অনুকরণের কথা এবং পরাশ্রয়ী সংস্কৃতি চর্চার কথা। ১৭৫৬ সালে লালবাজারে ইংরেজরা যে থিয়েটার স্থাপন করে এবং পরবর্তীতে তারই অনুসরণে ওই ইংরেজদের দ্বারাই ১৭৭৫ সালে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ও ১৭৮৭ সালে 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' নামে যে দু'টি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এসব দৃষ্টান্তে নাট্যক্ষেত্রে ইংরেজদের মধ্যে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তারই ফলশ্রুতিতে কলকাতা ও আশেপাশের শহরগুলিতে স্থাপিত হয় আরও আরও থিয়েটার। ১৮০৮ সালে চন্দননগরে গড়ে ওঠে এক থিয়েটার। 'দ্য এথেনিয়াম' নামে আর এক থিয়েটার গড়ে ওঠে কলকাতার লোয়ার সারকুলার রোডে, ১৮১২ সালে। ১৮১৫ সালে খিদিরপুরে স্থাপিত হয় আরও একটি থিয়েটার। Charies Franckling নামক এক আর্টিলারি অফিসার ১৮১৭ সালে দমদমে গড়ে তোলেন অন্য একটি থিয়েটার। ১৮২২ সালে ওই অফিসারের মৃত্যুর পর বণিক-পত্নী মিসেস এস্তার লীচ নামক এক তরুণী অভিনেত্রী সেই থিয়েটারের দায়িত্ব গ্রহণ করে তার আরও উন্নতি সাধন করেন। এর আগে ১৮১৩ সালে The Private Subscription Theatre নামে এক থিয়েটার স্থাপিত হয় চৌরঙ্গী রোডে! একশ' টাকা করে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ওই থিয়েটার গড়ে তোলা হয়। তার আসন সংখ্যা ছিল ওইকালে সর্বাধিক তিন শত। ওই থিয়েটারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ময়রা। ২৬ বছরেরও অধিক কাল ধরে চলে ওই থিয়েটার যাতে বিভিন্ন সময়ে অভিনীত হয় Henry IV, She Stoops to Conquer, The Merry Wives of Windsor প্রভৃতি নাটক। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক উইলসন, হিন্দু কলেজের ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন এবং ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ষ্টোকেলার প্রভৃতি নামকরা ব্যক্তিবর্গ ওই থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এতে তাঁরা সময়ে সময়ে অভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেছেন। অভিনেত্রী এস্তার লীচও ১৮২৫ থেকে ১৮৩৮

www.pathagar.com

সাল পর্যন্ত এই থিয়েটারে প্রধান অভিনেত্রীরূপে সংযুক্ত থেকেছেন। ১৮৩৯ সালে এই রঙ্গালয়টি আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। 'সাঁ সুসি' (Sans Souci) নামে আর একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১ সালে। মিঃ ষ্টোকেলার ও মিসেস লীচ ছিলেন এর যুগ্ম উদ্যোক্তা। তখনকার গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড এই থিয়েটারের জন্য এক হাজার টাকা দান করেন, আর ছয় হাজার টাকা সংগৃহীত হয় প্রাইভেট চাঁদার মাধ্যমে। অধ্যাপক উইলসন, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই থিয়েটারের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া ইংল্যান্ড থেকেও নিয়ে আসা হয় কতিপয় অভিনেতা-অভিনেত্রী। কিন্তু ১৮৪৩ সালে নাটক মঞ্চায়নের সময় মিসেস লীচের পোশাকে আগুন ধরে যায় এবং তাতেই তিনি কয়েকদিন পর মারা যান। ১৮৪৪ সালে এক ফরাসী কোম্পানীর কাছে এই থিয়েটার লিজ দিয়ে দেয়া হয়।

বিদেশীদের এসব থিয়েটারের মাধ্যমে সেকালে কলকাতা ও তার আশেপাশে নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যে পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে নির্দ্বিধায় ইউরোপীয় পরিমণ্ডল বলা যায়। ডক্টর পি. গুহ ঠাকুরতার কথায়, "At first the European theatres were patronized among the Bengalis by a few rich and influential men, the most noteworthy being the members of the Tagore" (The Bengali Drama, p. 43)। এখানে উল্লেখ্য যে, শুধু ইউরোপীয় থিয়েটার নয়—পরবর্তীতে বাংলা মঞ্চ-নাট্যের অনুশীলনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের একাধিক সদস্য। বিদেশীদের সঙ্গে ইউরোপীয় থিয়েটারের পেট্রোনাইজেশনের ব্যাপারে ঠাকুরদের কথাটা যখন এসেই গেল, এবং তাঁরাও যেহেতু ছিলেন পাশ্চাত্য ভাবাদর্শী কলকাতার নব্য শ্রেণীটির অন্যতম পুরোধা, তাই তাঁদের পরিচয়টা এখানে তুলে ধরা দরকার মনে করছি।

আগেই বলা হয়েছে, পলাশী বিপর্যয়ের পর বাংলায় প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করে কোম্পানির রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের বহু নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীর দল। তারা কৌশলে বহু জমির নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত হাসিল করত। তাদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জনাব আবদুল মওদুদ Modern History for Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, etc., vol II থেকে ঠাকুর পরিবারের যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, তাই এখানে উদ্ধৃত করছি। "এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ জয়রাম। তিনি বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ। আমীন হিসাবে তিনি কোম্পানীর চব্বিশ পরগণা জিলার বন্দোবস্ত কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে প্রভূত ভূমির মালিক হন। ১৭৬২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র দর্পনারায়ণ ইংরেজী ফরাসী ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেন এবং চন্দননগরের

www.pathagar.com

ফরাসী সরকারে চাকুরী করে প্রভূত অর্থের মালিক হন। তিনি সেসব অর্থ দিয়ে রাজশাহীর ব্রাহ্মণ জমিদারের বিশাল জমিদারী ক্রয় করেন। এই জমিদারীর বিস্তৃতি ছিল বর্তমান কুষ্টিয়া জিলাস্থ শিলাইদহ থেকে দিনাজপুর জিলার পত্নীতলা পর্যন্ত। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দ্বারিকানাথ ১৭৯৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেরবোর্ণ স্কুলে ইংরেজী এবং পরে ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। প্রথমে ল-এজেন্ট হিসাবে কাজ করে বাংলার সেকালীন ভূ-স্বত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় হয়। পরে তিনি চব্বিশ পরগণা জিলার নিমকি কালেক্টারের সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন ও ক্রমে দেওয়ান পদে উন্নীত হন। এখানে কার্যকালে তিনি অবিশ্বাস্যরূপেই ভাগ্য নির্মাণ করেন ভূম্যাধিকারীরূপে এবং নগদ অর্থের মালিক হিসেবেও। ১৮৩৪ সালে চাকুরী ত্যাগ করে তিনি পামার এণ্ড কোম্পানীর অংশ ক্রয় করেন এবং পরে চিনি ও শনের ব্যবসা করেন। তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশ ছিল ভূমি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত। পরবর্তীকালে তিনি প্রিন্স, রাজা উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁরই পৌত্র বাংলা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ।" (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ সংকৃতির রূপান্তর, নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃঃ ৮৮)।

আবার নাট্যালোচনায় ফিরে আসা যাক। ইতিমধ্যে, বিদেশীদের নাট্যক্রিয়াদির কালেই, ১৮১৬ অথবা ১৮১৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হিন্দু কলেজ। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর কথায়, "প্রধানতঃ দুইটি ঘটনা আমাদের নাট্যজগতে এই যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল— (১) কলিকাতায় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী স্থাপন; (২) কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা। ... ... ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরেজরাজ এই নগরে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী স্থাপন করিলেন, তখন ইহা স্বতঃই আমাদের জাতীয় জীবন ও কৃষ্টির কেন্দ্ররূপে পরিণত হইল...কলিকাতা নগরী ইউরোপের অ্যাথেন্স, লণ্ডন, প্যারিস, মাদ্রিদ প্রভৃতির ন্যায়ই আমাদের এখানে নাট্য-সাহিত্য ও নাট্যালয়ের পরিবর্তনে সমর্থ হয়। এই নূতন ধারা প্রবর্তনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল হিন্দুকলেজ।...কলিকাতায় হিন্দু বালকগণকে ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষা দানের জন্য এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ...এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া তদনুরূপ আরও দুইচারিটি উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল বিদ্যালয়ে ইংরেজী নাটক—বিশেষতঃ শেকসপিয়ারের নাটক—বিশেষ যত্নসহকারে পঠিত হইত এবং তাহার ফলে ছাত্রেরা ঐ সকল নাটকের বিশেষ অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা এ বিষয়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং পারিতোষিক বিতরণাদির সভায় তাহাদের দ্বারা পঠিত নাটকগুলি হইতে অংশবিশেষ আবৃত্তি করাইতেন। ফলে এই সকল নাটক পূর্ণভাবে অভিনয় করিবার জন্য তাহারা আগ্রহান্বিত হইয়া পড়ে এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন কলা-

www.pathagar.com

বিদ্যানুরাগী উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মনে পাশ্চাত্য ধরনের একটি নাট্যশালা স্থাপনের অভিলাষ জাগিয়া উঠে। এই অভিলাষ কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিয়াছিলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়। তিনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাগানবাড়ীতে 'হিন্দু থিয়েটার' নামে একটি ক্ষুদ্র নাট্যশালা করেন। কিন্তু এই থিয়েটারে কেবল ইংরেজী নাটক অভিনীত হইয়াছিল। ...এতদ্ভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রাঙ্গনে বা অন্য কোন স্থানে মঞ্চ বাঁধিয়া শিক্ষিত যুবকের দল মাঝে মাঝে ইংরেজী নাটকের অভিনয় করিতেন।" (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃঃ ৬৬–৭০)।

হিন্দু কলেজ বা এ জাতীয় অন্যান্য স্কুল-কলেজের নব্য শিক্ষিতরা এভাবে ইংরেজী নাটকের ও নাট্যানুষ্ঠানের ভক্ত হয়ে ওঠে। ওদিকে তখন পর্যন্তও বাঙ্গালীদের জন্য অভিনয় বা প্রমোদানুষ্ঠানের মধ্যে প্রচলিত ছিল যাত্রা, পাঁচালী কবি, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি। এ নিয়েই বাঙ্গালীরা অগত্যা সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু নব্য-শিক্ষিত ইংরেজী তথা ইংরেজ ভক্তরা তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। "যাত্রা প্রভৃতি গতানুগতিক আমোদ-প্রমোদ তাঁহাদের নিকট রুচিকর হওয়া দূরে থাকুক অত্যন্ত ঘৃণ্য মনে হইতে লাগিল। তাঁহাদের অনেকেই কলিকাতায় ইংরেজদের নাট্যশালায় ইংরেজী অভিনয় দেখিতে যাইতেন।" (বঙ্গীয় নাট্যশালা, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৪)। এমনকি, তাদের কেউ কেউ কখনো-সখনো ইংরেজদের নাট্যানুষ্ঠানের অভিনয়েও যোগ দিতেন। প্রকৃতপক্ষে, এই শ্রেণীর ইংরেজী-শিক্ষিত উচ্চবিত্তরাই নিজেদের বাড়ীতে ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে বাঙালীদের মধ্যে পাশ্চাত্য নাট্যকলার অন্ধ অনুকরণের স্পষ্টতা চিহ্নিত করলেন। ১৮৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর 'হিন্দু থিয়েটারের' দ্বারোদ্‌ঘাটিত হল শেকসপিয়ারের 'জুলিয়স সিজর' এবং অধ্যাপক উইলসন কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত সংস্কৃত কবি ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' নাটকের মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। অভিনয়কালে উপস্থিত ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, কর্ণেল ইয়ং, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি। ১৮৩২ সালের ২৯শে মার্চ এই 'হিন্দু থিয়েটারে' বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় গণ্যমান্যদের সমক্ষে মঞ্চস্থ হয় Nothing Superfluous নামক একটি প্রহসন।

এসব তো গেল ইংরেজী নাট্যক্রিয়াদির অন্ধ অনুকরণের কথা। অনুকরণের কথা আরও রয়ে গেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে–বিচ্ছিন্নভাবেই–লেবেডেফ-স্থাপিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করলেন নবীন চন্দ্র বসু। ১৮৩৫ সালে তিনি শ্যামবাজারে নিজবাড়িতে স্থাপিত পাশ্চাত্য ধরনের রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করলেন বিখ্যাত বাংলা উপাখ্যান 'বিদ্যাসুন্দরের' নাট্যরূপ। বাঙ্গালীর উদ্যোগে বাংলা নাটকের এই-ই হল সর্বপ্রথম অভিনয়। এই অভিনয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে 'হিন্দু পাইয়ো-

www.pathagar.com

নিয়ার' লিখেন : "...রাত্রি বারোটার কিছু পূর্বে অভিনয় আরম্ভ হয় এবং পর-দিন ভোর সাড়ে ছয়টায় শেষ হয়। ...যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে হিন্দু প্রথামত পরমেশ্বরের স্তোত্রপাঠ করা হয়, এবং প্রত্যেক দৃশ্যের পূর্বে একটি ভূমিকা আবৃত্তি করিয়া অভিনয়ের বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দৃশ্যাঙ্কন সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। চিত্রগুলির 'পারস্পেকটিভ' মেঘ, জল প্রভৃতি ঠিক হয় নাই। এইগুলিতে সুরুচি ও চিত্রাঙ্কনের রীতি-জ্ঞান উভয়েরই অভাব লক্ষিত হইল। কেবলমাত্র একটির উপরে আর একটিকে বিন্যস্ত করা ভিন্ন মেঘ ও জলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নাই। ... এই নাটকে বিশেষ করিয়া স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় খুব চমৎকার হইয়াছিল।" উল্লেখ্য, নবীন বসুর রঙ্গালয়েও লেবেডেফের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় মেয়েদের দিয়েই করানো হত। এই থিয়েটার স্থাপিত হয়েছিল অবিশ্যি ১৮৩৩ সালে। কিন্তু প্রথম দুই বছরে তাতে কোন নাট্যানুষ্ঠান হয়েছিল কিনা জানা যায় না। ১৮৩৫ সালের ২২শে অক্টোবর 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' এই দেশীয় নাট্যশালা সম্পর্কে লিখেন : "বৎসর দুই পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালাটি এখনও বাবু নবীনচন্দ্র বসুর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এটি শ্যামবাজারে স্বত্বাধিকারীর বাড়িতেই অবস্থিত। ইহাতে প্রতি বৎসর চার-পাঁচটি নাটক অভিনীত হয়। এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী ধরনে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে। ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দেখা যায় যাহা আমাদের এবং ভারতবর্ষের উন্নতিকামী বন্ধুমাত্রেরই নিকট অতিশয় আনন্দের বিষয়—এই নাট্যশালায় বাঙ্গালী রমণীরা সর্বদাই দেখা দিয়া থাকেন, কারণ, স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।" এই রঙ্গমঞ্চে 'বিদ্যাসুন্দর' ছাঁড়া আর কি কি নাটক অভিনীত হয়েছিল, তা জানা যায় না। অবশেষে কিছুদিনের মধ্যেই নবীন বসুর এই থিয়েটারও লুপ্ত হয়ে গেল। লেবেডেফের দৃষ্টান্তের মতই নবীন বসুর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তও অন্ততঃ আরও বিশ-একুশ বছরের জন্য দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

ইংরেজী নাটকের অভিনয় চলতে থাকল পাশ্চাত্য মডেলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্কুল-কলেজের রঙ্গমঞ্চে। ১৮৫৩ সালে শেকসপিয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অভিনীত হয় ডেভিড হেয়ার একাডেমিতে। ওরিয়েন্টাল সেমিনারিও স্কুলে 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' নামে একটি পুরাদস্তুর নাট্যশালা নির্মিত হয় এবং তাতে ১৮৫৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর অভিনীত হয় শেকসপিয়ারের 'ওথেলো'। এই থিয়েটারেই ১৮৫৪ সালের ২রা মার্চ অভিনীত হয় 'মার্চেন্ট অব ভেনিস,' ১৮৫৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী শেকসপিয়ারেরই 'রাজা চতুর্থ হেনরি'। এসব হচ্ছে এদেশীয় ইংরেজী শিক্ষার্থীদের স্কুল-কলেজে অভিনীত নাটকের তথ্যাংশ। স্কুল-কলেজের বাইরে নবীন চন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসুর জোড়া-

www.pathagar.com

সাকোর বাড়ীতে নির্মিত রঙ্গমঞ্চে ১৮৫৪ সালের ৩রা মে অভিনীত হয় শেকস-পিয়ারের 'জুলিয়াস সিজর'।

এই যে এতসব নাট্যানুষ্টান ও নাট্যমঞ্চের বিবরণ দেয়া গেল, তার অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন ড্রামাটিক ক্লাবের নাট্য প্রয়াসের মত। 'থিয়েটার' শব্দটাকে সে-অর্থেই গ্রহণ করা উচিত। ওই সময়টায় কলকাতার নব্যশিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদের দ্বারা যেসব থিয়েটার নির্মিত হয়েছিল, তার কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ইংরেজদের দেখাদেখি নব্য বাঙ্গালীরা একাজে এগুলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন এসব প্রয়াস ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত সখ বা খেয়ালভিত্তিক। তাই পাশ্চাত্যধর্মী এই শিল্পরীতিকে এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে একীভূত করে স্থায়ী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এর তেমন কোন অবদান ছিল না। এসব প্রয়াস ছিল পাশ্চাত্যানুকরণের অনুশীলন মাত্র। তাই কৃত্রিম ও অনেকাংশে নিষ্ফল। অবিশ্যি এদেশীয় আধুনিকতা বিলাসীদের রুচি নির্মাণে এমনি অনুশীলনেরও প্রয়োজন ছিল। এই নিষ্ফলতার প্রধান কারণ, তখনকার দিনে বাংলা ভাষায় মৌলিক নাটকের একান্ত অভাব। বিদেশী নাট্য-রীতিকে এদেশীয়-দের ধাতস্থ করানোর লক্ষ্যে ইংরেজী নাটকের মূল বা অনুবাদের অভিনয় দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোরই সামিল। এমনি প্রচেষ্টা সাধারণত কৃত্রিমতায়ই ভারাক্রান্ত হয়। বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পথ-পরিক্রমার ওই অনুকরণের কালটিতে তা-ই হয়েছিল অবস্থাটা।

———

www.pathagar.com

তিন/অনুসরণ

কাল-পরিক্রমায় ক্রমে এল ১৮৫৭ সাল। এই ১৮৫৭ সাল থেকেই এদেশের নাট্য-ধারায় দেখা দিল এক নতুনত্ব যা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে বহুদিন। এমনকি, এই নতুনত্বের পরে এদেশে বাঙালীদের দ্বারা ইংরেজী নাটক মঞ্চায়নের সকল প্রচেষ্টাই কার্যতঃ থেমে গেল। নতুনত্বটি হল বাংলা ভাষায় 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের অভিনয়। সাতুবাবুর বাড়ীতে তার দৌহিত্রেরা নন্দকুমার রায় অনূদিত মহাকবি কালিদাসের এই নাটকের মঞ্চায়ন করেন ১৮৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারী। সরস্বতী পূজা উপলক্ষে অভিনীত হয় এই নাটক। আবার ১৮৫৭ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হয় মণিমোহন সরকার রচিত মৌলিক নাটক 'মহাশ্বেতা'। এই বছরের জানুয়ারী আর সেপ্টেম্বরের মধ্যে আর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা হচ্ছে বাংলা ভাষায় পুরোপুরি সামাজিক নাটকের মঞ্চায়ন। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব'ই হচ্ছে সে-নাটক। বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে তখন সমাজ সংস্কারের আন্দোলন বেশ জোরদার। তারই সপক্ষে রচিত হয়েছিল এ-নাটক। ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে উক্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়। অল্প দিনের মধ্যেই এ-নাটকের আরও দু'টি অভিনয় হয়। তৃতীয়বারের অভিনয় হয় ১৮৫৮ সালের ২২শে মার্চ। তৃতীয়-বারের অভিনয়ে "বড়বাজারস্থিত এই রঙ্গভূমি প্রায় ছয় সাত শত লোকে পরি-পূর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী মোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ আগমন করিয়া সভামণ্ডপ শোভিত করিয়াছিলেন।" (বঙ্গীয় নাট্যশালা, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় – উদ্ধৃত)। এর আগে অবিশ্যি রামনারায়ণ তর্করত্নেরই অনূদিত 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় হয় কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ীতে, 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে'। ওই 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে' কালীপ্রসন্ন সিংহেরই অনূদিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৮৫৭ সালের ২৪শে নভেম্বর। 'বেণীসংহার', 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' ও 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় নিশ্চিতভাবেই এক নবযুগের সূচনা করে বাংলা মঞ্চনাট্যের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে। এর মধ্যে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' আরও বিশিষ্ট এজন্য যে, তা এই নব-যুগের প্রথম সামাজিক নাটক।

এরপর আসে 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'র কথা। পাইকপাড়ার রাজাদের বাগান বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং তাঁর সহোদর ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ! সে-যুগের আরও কতিপয় ইংরেজী শিক্ষিত যুবক এই নাট্যপ্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটক 'রত্নাবলী' অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত নাটক নিয়ে 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'র দ্বারোদঘাটিত হয় ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই। সে-মঞ্চে ছয়-সাত বার অভিনীত হয় এই 'রত্নাবলী' নাটক। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় "অভিনয় দর্শনের জন্য বহু বিশিষ্ট ইংরেজ নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহাদের সুবিধার জন্য পাইকপাড়ার রাজারা 'রত্নাবলী' নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করাইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ কার্যের ভার পড়িয়াছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের উপর"। (বঙ্গীয় নাট্যশালা, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪)। বাংলা মঞ্চ-নাট্যের ইতিহাসে এটা এক স্মরণীয় ঘটনা এ জন্য যে, এই 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখেই মাইকেল মধুসূদন দত্তের মনে নাটক লেখার সংকল্প জাগে।

মধুসূদন সঙ্গে সঙ্গে রচনা করেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। বেলগাছিয়া নাট্যশালা-তেই তা প্রথম অভিনীত হয় ১৮৫৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। ২৭শে সেপ্টেম্বর হয় তার ষষ্ঠ এবং শেষ অভিনয়। বাংলার লেফটেনান্ট-গভর্ণর গ্র্যান্ট সাহেব এবং আরও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি 'শর্মিষ্ঠা'র এই অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। এবারেও রাজারা বিদেশী দর্শকদের সুবিধার জন্য 'শর্মিষ্ঠা'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে-ছিলেন। ১৮৬১ সালের ২১শে মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই নাট্যশালার অস্তিত্ব লোপ পায়।

এর আগে ১৮৫৩ সালে রামগোপাল মল্লিকের প্রাসাদে স্থাপিত হয় 'হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ' এবং তারই সঙ্গে 'মেট্রোপলিটন থিয়েটার'। এই থিয়েটারে ১৮৫৯ সালের ২৩শে এপ্রিল মঞ্চস্থ হয় উমেশ চন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবা বিবাহ' নাটক। খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও এখানে উল্লেখ করে রাখা যায়, ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৫৭ সালে এবং ১৮৫৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সর্বপ্রথম বি. এ. পাস করে বেরিয়েছেন।

ওই সময়ে কলকাতায় আরও বেশ কয়েকটি রঙ্গালয় স্থাপিত হয় যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়', 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি', 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' ও 'বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়'।

www.pathagar.com

"পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়' স্থাপিত হয় ১৮৬৫ সালে, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে। এর আগে ঠাকুর পরিবারের আদি বাড়িতে একটি রঙ্গালয় ছিল। তাতে ১৮৫৯ ও ১৮৬০ সালে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে অভিনীত হয়েছিল 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক। এবার ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সেখানে অভিনীত হল 'বিদ্যাসুন্দর', এবং ১৮৬৬ সালের ১৫ই ডিসেম্বর 'বুঝলে কিনা' নামক প্রহসন এবং ১৮৬৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী রামনারায়ণের 'মালতী মাধব' নাটক। সে-মঞ্চে রামনারায়ণেরই দুটি প্রহসন 'চক্ষুদান' ও 'উভয় সঙ্কট' অভিনীত হয় ১৮৭০ সালের প্রথম দিকে এবং 'রুক্মিণীহরণ' ও 'উভয় সঙ্কট' ১৮৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারী। "১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫-এ ফেব্রুয়ারী রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীতে পদার্পণ করেন। তাঁহার সম্মানার্থে 'রুক্মিণীহরণ' ও 'উভয় সঙ্কটে'র অভিনয় হয়। গভর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে বহু সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা এই নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য নাটকগুলির ইংরেজী চুম্বক দেওয়া হইয়াছিল।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭)।

কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখদের 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' রঙ্গমঞ্চে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' অভিনীত হয় ১৮৬৫ সালের ১৮ই এবং ২৯শে জুলাই। ১৮৬৭ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী সেখানে অভিনীত হয় মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক।

ঠাকুরবাড়ীর 'জোড়াসাঁকো থিয়েটারে' প্রথমে অভিনীত হয় মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' এবং তার কিছুদিন পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা ?'। ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী সেখানে মঞ্চস্থ হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব নাটক'। এই থিয়েটারের প্রধান উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে-সময়কার ধনশালীদের সখের নাট্যশালায় নাট্যক্রিয়াদির ধরন-ধারণ সম্পর্কে একটা চিত্র তুলে ধরার জন্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবন-স্মৃতি' থেকে 'নব নাটক' সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "দোতলার হলের ঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া সীন আঁকিতে আরম্ভ করিল। ...নাট্যোল্লিখিত পাত্র-গুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম নটী, আমার জ্যেঠতুত ভগ্নীপতি * নীলকমল মুখোপাধ্যায় (পরে গ্রেহামের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি) সাজিলেন নট, আমার নিজের আর এক ভগ্নীপতি * যদুনাথ মুখোপাধ্যায় 'চিন্ত ঘোষ', আর এক ভগ্নীপতি * সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন গবেশবাবুর বড় স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অক্ষয় মজুমদার লইলেন গবেশবাবুর পাঠ। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ...অতঃপর ভূমিকা সমস্ত স্থির হইয়া গেল, দোতলার বড় ঘরে, খুব ঘটা করিয়া রিহার্সাল বসিয়া গেল। ...অভিনয় দর্শনের জন্য কলকাতার

www.pathagar.com

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।" (বঙ্গীয় নাট্যশালা, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—উদ্ধৃত, পৃঃ ১৯)।

'বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে' ১৮৬৮ সালের গোড়ার দিকে মঞ্চস্থ হয় মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' নাটক, ১৮৭৪ সালে মনোমোহন বসুরই 'সতী' নাটক এবং ১৮৭৫ সালে একই নাট্যকারের 'হরিশচন্দ্র' নাটক।

উপরোক্ত নাট্য-প্রয়াসের খতিয়ান থেকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এদেশীয় নব্য বিত্তশালীদের পরিবারভুক্ত ইংরেজী-শিক্ষিত এবং আধুনিকতাভিলাষী নব্য শ্রেণীটি প্রাথমিক যুগে ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণে মেতে ইংরেজদের মতই ইংরেজী নাটক মঞ্চস্থ করায় সচেষ্ট থাকেন। ক্রমে অনুকরণের যুগ পেরিয়ে তাঁরা এসে উপনীত হন অনুসরণমুখী অনুশীলনের যুগে। এই যুগে তাঁরা হিন্দু ধর্মীয় ক্লাসিক্যাল সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ অথবা রূপান্তর পাশ্চাত্য মডেলের মঞ্চে উপস্থাপিত করতে থাকেন। এই সময়ে আবার সমাজ-সংস্কারের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলা সামাজিক নাটকেরও আত্মপ্রকাশ ঘটে। তবুও, সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, এসব নাট্য-প্রয়াসের কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। এসব নাট্যানুষ্ঠানে সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্তদেরও প্রবেশাধিকার ছিল না, জনসাধারণের কথা তো ওঠেই না। রাজপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ইংরেজ ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্যোক্তাদের অভিপ্রায় ছিল বলে মনে হয়। বৃহত্তর জাতি-সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না এসব নাট্য-প্রয়াস। অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের মতে, এদেশে যখন "য়ুরোপীয় নাটকের অনুকরণে নাটক অভিনয়ের সূত্রপাত হইল, তখন যে বস্তু বিশেষ করিয়া চমক লাগাইয়াছিল, তাহা একটা বহিরঙ্গ ঘটিত ব্যাপার। নাটক রচনার যে আভ্যন্তরীণ প্রেরণা, তাহার নিতান্ত অভাব সত্ত্বেও প্রকৃত নাট্যরস কি, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চেতনা জন্মিবার পূর্বেই রঙ্গমঞ্চ, সাজসজ্জা ও বক্তৃতাই যে সেকালের নাগরিক বাঙ্গালী সমাজকে উতলা করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ বাংলা নাটকের অভাবে সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া তাহারই অভিনয় করিতে আমাদের বাধে নাই। জাতির রস-সংস্কারের অনুকূল নয় বলিয়া, এবং বিলাতী ধরনের রঙ্গমঞ্চ স্থাপন আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপযোগী নয় বলিয়া, এই বিলাতী বহিরঙ্গকে বজায় রাখিয়া নাটকের উন্নতি সাধন বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছিল। ধনীর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সখের নাট্যাভিনয় একটা প্রমোদমাত্র, নাটক হিসাবে তাহা প্রাণহীন; কারণ সে নাটকের অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ প্রবাহী রসধারা সর্বজন হৃদয়াভিমুখী হইবার উপায়ও ছিল না—আবশ্যকতাও

www.pathagar.com

ছিল না; অতএব তাহা জাতির চিত্তসাগরসঙ্গমে মিলিত হইয়া নাটকের রসপ্রেরণাকে সার্থক করিয়া তুলিত না; প্রায় পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ এমনই একটা বিড়ম্বনার মত, একটা ক্ষুদ্র নাগরিক সমাজের ব্যর্থ প্রমোদ-পিপাসার নিদর্শনস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ওদিকে তখন গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালীর খাঁটি বাঙ্গালী প্রাণ উন্মুক্ত আকাশ তলে শামিয়ানা খাটাইয়া ইতর-ভদ্রের বিরাট আসর জমাইয়া সারারাত্রি জাগিয়া কৃষ্ণযাত্রা ও নানা পুরান প্রসংগের গীতাভিনয় শুনিতেছে।" (সাহিত্য বিচার, মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ ১৭৩-১৭৪)।

এই 'ক্ষুদ্র নাগরিক সমাজ'টি রাষ্ট্রীয় চেতনা ও স্বাদেশিকতার দিক থেকেও আপামর জনসাধারণ থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। শুধু বিচ্ছিন্নই নয়, বিদেশী রাজ-শক্তির দোসর ও সহযোগী হিসাবে জনসাধারণের প্রতিপক্ষও। আগেই বলা হয়েছে, ১৮৫৭ সাল থেকে এদেশীয়দের নাট্যানুশীলনের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। তার সংগে এও স্মরণীয় যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে এই সময়টা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সময়। ওই সময়ে কলকাতাকে কেন্দ্র করে নাটক তথা সমগ্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যখন নবযুগ আরম্ভ হয়েছে, সমগ্র উপমহাদেশটিতে চলছে তখন আগুন ঝরা দিন রাতের পরিক্রমা। ইংরেজ-অনুগত এদেশীয় নব্য বিত্তশালীদের প্রাসাদে বা বাগানবাড়িতে নির্মিত পাশ্চাত্য মডেলের মঞ্চে অভিনেয় নাটক উপভোগ করার সুবিধার জন্য বিদেশী রাজপুরুষদের হাতে যখন তুলে দেয়া হচ্ছে সে-নাটকের ইংরেজী অনুবাদ, সেই বিদেশীদের কাছে হারানো স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য চলছে তখন এদেশীয় সিপাহী-জনতার মরণপণ সংগ্রাম। জানি, আঠারশ' সাতান্ন-আটান্নর এই যুদ্ধ নিয়ে বিজ্ঞজনদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ এটাকে অভিহিত করেন সিপাহীদের নিছক একটা অভ্যুত্থান বলে। কেউ কেউ এটাকে চিহ্নিত করেন জোয়ান-জনতার সম্মিলিত মুক্তি-সংগ্রাম বলে। কার্ল মার্কস-ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তো এটাকে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধ বলেই তার কার্যকারণমূলক বিশ্লেষণ দিয়েছেন। এই ঘটনার চারিত্র্য বর্ণনা করতে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন ঃ "১৮৫৭-৫৯ সালের অভ্যুত্থান বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের বৃহৎ জাতীয় মুক্তি অভ্যুত্থান। অতিরিক্ত রকমের করভার, ভারতীয় কৃষকদের প্রায় লুণ্ঠন এবং সামন্তদের কোনো কোনো স্তরের উচ্ছেদ; কর আদায়ের জন্য নির্যাতন ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক সন্ত্রাসরাজ, এবং জনগণের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও প্রথার উপর ঔপনিবেশিকদের স্থূল আঘাত—ঔপনিবেশিক শোষণের এই পাশবিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সব অংশের ঘৃণার ফলে, প্রথমে বৃটিশ ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে কতকগুলি সশস্ত্র সংঘাত দেখা দেবার

www.pathagar.com

পর অভ্যুত্থান জেগে ওঠে।" (প্রথমে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯, কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, মস্কো, পৃঃ ২২৮)।

দেশের এমনি পরিস্থিতিতে ইংরেজদের প্রসাদ-পুষ্ট কলকাতার এই নব্য বিত্তশালী শ্রেণীটি যে চরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে ওই জাতীয় নাট্য তথা সংস্কৃতি চর্চা করবেন, এতো খুবই স্বাভাবিক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় কলকাতার নব্য সম্প্রদায়, যেটি পাশ্চাত্য প্রভাবজাত, সেদিন সে-সম্প্রদায় শুধু চুপ করে থাকেনি; সক্রিয়ভাবে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। (Autobiography of Debendra Nath Tagore)। হুমায়ুন কবীর বলেন: ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বার বার উল্লেখ করেছেন, দেশের সর্বত্রই মধ্যবিত্ত সমাজ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ইংরেজ রাজশক্তির সহায়তা করেছে। (চতুরঙ্গ, ১৩৬৪ শ্রাবণ)। এস. এন. সেন লিখেছেন: কলকাতার শিক্ষিত ভদ্র নাগরিকগণ এবং মাদ্রাজের ন্যায় বাংলার তাবৎ ভূম্যাধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় এই বিদ্রোহের ও বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেছেন। (Eighteen Fiftyseven : S. N. Sen)।

জন-সংযোগ বিচ্ছিন্ন এসব নাট্য-প্রচেষ্টা সম্পর্কে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু বলেন: "গণশিক্ষার বাহন ও ভগবৎ প্রেমের পরিবেশকরূপে যাত্রা ছিল আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সেই জন্য যাত্রার আসরে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবযুগের রঙ্গালয়সমূহে নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ দূরে থাকুক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকগণ পর্যন্ত সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন না। সেগুলিতে কেবল পরিচালকবর্গের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ব্যতীত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও সাহেবসুবা নিমন্ত্রিত হইতেন এবং সাহেবদের প্রশংসা লাভের জন্য তাহারা এত ব্যগ্র ছিলেন যে, যে-সকল সাহেব অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের থিয়েটার দেখিতে আসিতেন তাঁহাদের বোধসৌকর্যার্থে বহু ব্যয় করিয়া অভিনীত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করাইতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং এই সকল রঙ্গালয়কে আর যাহা হউক বিনা আপত্তিতে জাতীয় নাট্যশালা নামে অভিহিত করা যাইত না"। (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৭৫)।

বাংলা মঞ্চ-নাট্যের এই প্রাথমিক কালটিতে অন্য একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে: এসব নাট্য-প্রচেষ্টায় মুসলমানদের পুরোপুরি অনুপস্থিতি। ফলে বাংলায় যে মঞ্চ-নাট্যের সৃষ্টি হল তা হয়ে দাঁড়াল পুরোপুরি হিন্দু মঞ্চ-নাট্য। শুধু মঞ্চ-নাট্যে কেন, পাশ্চাত্যধর্মী এই মঞ্চ-নাট্যের আগেও দেশীয় যাত্রানুষ্ঠানেও মুসলমানদের অংশিদারিত্ব ছিল না। পাশ্চাত্যধর্মী প্রচেষ্টায়ও

www.pathagar.com

রইল না। এই না-থাকার পেছনে ধর্মীয় অনুশাসনজাত অনীহা ও প্রতিবন্ধকতা ছিল মূল কারণ। পৃথিবীর বিভিন্ন নাট্যধারার ইতিহাস পাঠে জানা যায়, দেব মন্দিরের অঙ্গনেই সে সবের জন্ম। পাশ্চাত্য নাটকের জন্ম প্রাচীন গ্রীসে দিওনিসাস দেবতার মন্দিরে। মধ্যযুগে খৃষ্টান নাটকের জন্মও চার্চের আঙ্গিনায়। তেমনি এদেশে ধর্ম-সংলগ্ন হয়েই যাত্রার উদ্ভব এবং তার সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমা। অথচ ইসলামের বেলায় তা হল না, হওয়া সম্ভবও ছিল না। তাই এদেশে হিন্দুধর্ম সংলগ্ন নাট্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ থেকে সেদিন পর্যন্ত দূরেই থাকলেন মুসলমানেরা। আর পাশ্চাত্যধর্মী মঞ্চ-নাট্য যখন বাংলায় দেখা দিল, তখন তো তাদের অবস্থিতি রাজধানী কলকাতার উজ্জ্বল আলো থেকে বহু দূরে নিরাশার চাপচাপ অন্ধকারে প্রতিরোধ আর মরণপণ সংগ্রামের বন্ধুর পথে!

আর কলকাতা-কেন্দ্রিক নব্য নাট্যামোদীরা ততদিনে ইংরেজের অন্ধ অনুকরণ ছেড়ে নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন। তাই তো পাশ্চাত্য মডেলের কলেজের নাম হিন্দু কলেজ, থিয়েটারের নাম হিন্দু থিয়েটার, ইংরেজী পত্র-পত্রিকার নাম হিন্দু পেট্রিয়ট, হিন্দু পাইয়োনিয়ার, মেলার নামও হিন্দু মেলা। বাংলায় নাটক যখন লেখা হচ্ছে, তাও লেখা হচ্ছে সঙ্গত কারণেই হিন্দু পুরানের কাহিনী নিয়ে, রামায়ণ-মহাভারতের কর্মকাণ্ড নিয়ে। নব্যশিক্ষিত নাট্যকর্মীদের সবাই যেহেতু ধর্মে ছিলেন হিন্দু, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের সৃষ্টি ক্ষেত্রও চিহ্নিত হয়েছে হিন্দু-নামে। এমনি একটি বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে পরবর্তীতে যখন এই নাট্য-প্রচেষ্টা আরও অগ্রসর হয়ে সখের পর্যায় অতিক্রম করে জাতীয় পরিচয় পর্যায়ের লক্ষ্যে পা বাড়িয়েছে, তখনও তার পরিচয়-প্রকৃতি হিন্দুই থেকে গেছে।

www.pathagar.com

চার/সাধারণ রঙ্গালয়ের পথে

বিত্তবানদের সখের নাট্য-প্রচেষ্টা যখন যথেষ্ট জোরদার, তখন ১৮৬০ সালে কলকাতাস্থ আহিরীটোলার রাধামাধব হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার' নামে একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে চেষ্টা সফল হয়নি। অবশেষে এর একযুগ পরে এমনি এক প্রচেষ্টায় সফল হন বাগবাজারের কতিপয় নাটকপাগল উৎসাহী যুবকের একটি নাট্য-সম্প্রদায়। এই নাট্য-সম্প্রদায়ে ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর প্রভৃতি বাগবাজারের কয়েকজন যুবক। পরে এই সম্প্রদায়ে যোগ দেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও অমৃতলাল বসু। প্রথমে এই নাট্য-সম্প্রদায়ের নাম ছিল 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার', পরে এর নামকরণ করা হয় 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'।

কলকাতায় বিত্তবানদের প্রাসাদে বাগানবাড়িতে নির্মিত মঞ্চে মঞ্চে যখন নাট্যানুষ্ঠানের হিড়িক, তখন বাগবাজারের এসব যুবকের মনে নাট্যাভিনয়ের প্রবল উৎসাহ ঘনীভূত। ওঁরা কেউই ছিলেন না রাজা-মহারাজা জাতীয় খুব বিত্তশালীদের সন্তান। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলেন তাঁরা। তাঁদের প্রথম অভিনীত নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'। প্রথম অভিনয় হয় বাগবাজারে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে। নানাজনের বাড়িতে চলতে থাকে 'সধবার একাদশী'র অভিনয়। ১৮৬৯ সালে শ্রীপঞ্চমীর রাত্রিতে রায়বাহাদুর রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়িতে হয় এই নাটকের চতুর্থ অভিনয়। সাত বার এই নাটকের অভিনয়ের পর তাঁরা দীনবন্ধু মিত্রেরই 'লীলাবতী' নাটকের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু নানা প্রতিবন্ধকতার জন্য বিলম্বিত হতে থাকে এই নাটকের মঞ্চায়ন।

ওদিকে চুঁচুড়ায় বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রমুখ কৃতবিদ্য কতিপয় ব্যক্তির উদ্যোগে অভিনীত হয়ে যায় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'। এ খবর পেয়ে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' অল্পদিনের মধ্যেই 'লীলাবতী' মঞ্চস্থ করেন। ১৮৭২ সালের মে মাসে। এই 'লীলাবতী'র

www.pathagar.com

অভিনয় দলটিকে খ্যাতির শীর্ষে উঠিয়ে দেয়। 'লীলাবতী'র টিকেট বিক্রি করা হয়। "পর পর তিনটি শনিবার অভিনয় হওয়া সত্ত্বেও অনেকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন—'শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রনাথ পালের বহির্বাটির প্রাঙ্গনে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত; দৃশ্যপটগুলি ধর্মদাস বাবুর তুলিতে অঙ্কিত, সামান্য চাঁদার অর্থে কার্যসম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু অভিনয়ের সুখ্যাতি এত বিস্তৃত যে, দলে দলে লোক টিকেটের উমেদার'।" (বঙ্গীয় নাট্যশালা, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, পৃঃ ২৫)। 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় দেখার জন্য লোকেরা যেরূপ আগ্রহ দেখিয়েছিল তা লক্ষ্য করেই এই নাট্যসমাজ একটি সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, এঁরা ছিলেন নিতান্ত সাধারণ মধ্য-বিত্তের সন্তান, তাঁদের মত ধনাধিকারী ছিলেন না যাঁরা সখের থিয়েটারে আমন্ত্রিত ইংরেজ অতিথির বোধসৌকর্যার্থে অভিনেয় নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে তা 'মহামান্যদের' হাতে তুলে দিতে পারেন। এমনকি, অভিনয়ের ব্যয় কমাবার জন্য দামী পোশাক বহুল পৌরাণিক নাটকের বদলে অভিনয়ের জন্য তাঁদের নির্বাচন করতে হয় কেবল দীনবন্ধু মিত্রের সামাজিক নাটক। সামাজিক নাটকে দামী পোশাকের প্রয়োজন ছিল না।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, সখের থিয়েটার থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে। বাগবাজারের এমেচার থিয়েটার বা শ্যামবাজার নাট্যসমাজের তরুণেরাও সখের তাড়নাতেই নাট্য-সম্প্রদায় গড়েছিলেন এবং তাঁদের 'সধবার একাদশী' ও 'লীলাবতী'র মঞ্চায়ন হয়েছিল এমেচার হিসাবেই। 'লীলাবতী'র অভিনয়ে দর্শকবৃন্দের উৎসাহ লক্ষ্য করেই তাঁরা থিয়েটারকে এমেচার থেকে 'প্রফেশন্যাল' করতে অগ্রসর হন। সখের নাট্যদল হিসাবে তাঁদের সঙ্গে পূর্ববর্তীদের পার্থক্য ছিল ঃ পূর্ববর্তী সখের নাট্যানুষ্ঠানগুলো করতেন রাজা-রাজড়াদের সন্তানেরা তাঁদের প্রাসাদে বা বাগানবাড়িতে মঞ্চ নির্মাণ করে। এটা ছিল তাঁদের নিছক সখ বা হুজুগের ব্যাপার। তাঁদের কারও মৃত্যু হলে, মতের পরিবর্তন হলে বা উৎসাহের বিলুপ্তি ঘটলে নাট্যশালারও বিলুপ্তি ঘটত। কিন্তু বাগবাজার বা শ্যামাবাজারের দলের নাট্যোৎসাহে ছিল নাট্যব্রতীর দৃঢ় সন্কল্প। সংজ্ঞানুসারে প্রফেশন্যাল থিয়েটার অর্থ-ভিত্তিক হলেও এ নাট্যসমাজ অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে তা স্থাপন করতে অগ্রসর হননি। এ সম্পর্কে এই দলেরই অন্যতম সদস্য অমৃতলাল বসুর স্মৃতি-কথা অনুসারে ঃ "নিজেদের জীবিকার উপায় মনে ক'রে আমাদের মধ্যে একজনও তখন টিকেট বিক্রি ক'রে থিয়েটারের অভিনয় করবার কল্পনা মাথায় নেননি। এখন একটা সখের থিয়েটার বসালে ষ্টেজ, সিন, সাজ-গোজ, পোশাক, হয় চেয়ে নয় ভাড়ায় সহজেই পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

তখন আর্শি, বুরুষ, চিরুনীখানি পর্যন্ত কিনতে হত—হয় নিজেদের বাড়ী থেকে ভুলিয়ে, নয় আব্দার করে চেয়ে নিতে হত, মেয়ে সাজবার শাড়ী ও গয়না ঐ উপায়ে সংগ্রহ করা গেছে। পাড়ার লোকের কাছে বার বার চাঁদা চাইতে গেলে তাঁরা সব বিরক্ত হতেন, এটা একেবারে দোষের কথা নয়। নগেনের মাথাতেই প্রথম মতলব আসে যে, সাহেবরা যেমন টিকেট বেচে সব খরচ চালায়, আমাদের মাইনে-পত্তর দেওয়া টেওয়া নেই, শুধু সিন, পোশাক, পরচুলা প্রভৃতি প্রস্তুত করে আলো জ্বালিয়ে ৫/৭ রাত্রি একখানা বইয়ের অভিনয় চালাবার খরচ কেন আমরা ঐ রকম টিকিট বিক্রি করে চালাতে পারব না। আর একটা কারণেও টিকিট বিক্রির কল্পনা হয়; সখের থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা অভিনয় দেখাবার জন্যে নিজেদের পরিচিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরই টিকিট পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করতেন, অপর ভদ্রলোক টিকিটের জন্য প্রার্থনা ক'রে কখনও বা সফল হতেন, সময়ে সময়ে কেউ কেউ যে অপমানিত হতেন না একথা জোর ক'রে বলতে পারিনে; প্রবেশের মূল্য ধার্য হ'লে অনেকে অন্ততঃ একটা আধুলি দিয়েও সম্মানের সঙ্গে বসতে পারেন। সাধারণ থিয়েটার খোলার এও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।" (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪)।

একাজে এগোবার আগে এমেচারকে প্রফেশন্যাল করার প্রস্তাব নিয়ে দলের মধ্যে মতভেদ যে ছিল না, তা নয়। আবার প্রফেশন্যাল থিয়েটার খোলার এ-প্রস্তাবের সঙ্গে সংযুক্ত হল আরও একটি প্রস্তাব: নূতন নাট্যশালার নাম হবে 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'। দলের বেশীর ভাগ সদস্যই এই প্রস্তাব দু'টির সপক্ষে। কাজেই প্রস্তাব দু'টি গৃহীত হয়ে গেল। এতে গিরিশ ঘোষ একমত হতে না পারায় তিনি দল থেকে সরে দাঁড়ালেন। গিরিশচন্দ্রের মত ছিল: ন্যাশন্যাল থিয়েটার নাম দিয়ে তার উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই জনসাধারণের কাছে টিকেট বিক্রি করে অভিনয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে: "একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাশন্যাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে— এই আমার আপত্তি। ন্যাশন্যাল থিয়েটারের নামে অনেকেই বুঝিবে যে, ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশন্যাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ।" (বঙ্গীয় নাট্যশালা, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— উদ্ধৃত, পৃঃ ২৭)। কিছুদিন পরে অবিশ্যি তিনি আবার দলে ফিরে এসেছিলেন।

আসলে থিয়েটারটির 'ন্যাশন্যাল' নামকরণ করেছিলেন জাতীয় ভাবের অত্যুৎসাহী ব্যক্তি নবগোপাল মিত্র। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নাম ছিল

www.pathagar.com

'ন্যাশন্যাল পেপার'। প্রায় সব ব্যাপারেই তাঁর মুখে অবশ্য-বুলি ছিল 'ন্যাশন্যাল'। এজন্য লোকে তাঁর ডাকনাম দিয়েছিল 'ন্যাশন্যাল নবগোপাল'। বঙ্কিম-প্রভাবিত সেই যুগটায় বাঙালী যুবকদের জন্য যে ব্যায়ামাগার তিনি স্থাপন করেন, তারও নাম দিয়েছিলেন 'ন্যাশন্যাল স্কুল'। এমনকি, 'ন্যাশন্যাল সার্কাস' নাম দিয়ে একটি বাঙালী সার্কাস পার্টিও গঠন করেন তিনি। প্রধানতঃ তাঁর উদ্যোগেই সেকালের 'ন্যাশন্যাল সোসাইটি' বা জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয়ভাব উদ্দীপনার্থ বাৎসরিক 'হিন্দু মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, "এই জাতীয় সভা ও হিন্দু মেলাকে কংগ্রেসের অগ্রদূত বলিলে অন্যায় হয় না। এই মেলাটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার কার্য আরম্ভ হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। এই সভা ও মেলার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন বসু প্রমুখ শিক্ষিত দলের বহু নেতা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন-মুখ চন্দ্রিমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান', মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন' প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গানগুলি এই মেলাতেই গাহিবার জন্য প্রথম রচিত হয়।" (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃঃ ৮০)।

এখানে স্মরণীয় যে, এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের পেছনে মেকলে প্রমুখদের উদ্দেশ্য অন্ততঃ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সফল হয়নি। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের "...তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সরকারী কর্মচারী উৎপাদন করা, আইনজীবী, ডাক্তার ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কেরানী সৃষ্টি করা। এই সংকীর্ণ অর্থে তাদের প্রচেষ্টা আশ্চর্যভাবে ফলবতী হয়েছে। কিন্তু তাদের পূর্ণ ব্যর্থতা হয়েছে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে।" (Education in India, Arthur Mayhew, p. 149)। দেহাবরণে পাশ্চাত্য লক্ষণাদি ধরা পড়লেও এদেশীয় ইংরেজী শিক্ষিতদের মেটে-রঙের চামড়ার অন্তরালের মনটি মোটেই 'খাঁটি ইংরেজ' হয়নি, এদেশীয়ই থেকে গেছে। ইয়ং-বেঙ্গলের স্রোতোধারা অবরুদ্ধ হয়ে গেছে অল্পদিন পরেই। বিনয় ঘোষের মতে, অঙ্কুরেই পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ ও নীতি শুকিয়ে গেছে, শুধু অবশিষ্ট থেকেছে ব্যর্থ অনুকরণ জড়িত পরাধীন জাতির অঙ্গে বিদেশী প্রভুদের শত লাঞ্ছনার চিহ্ন। (বাঙ্গালী বিদ্বৎ সমাজের সমস্যা, চতুরঙ্গ, ১৩৬৪ বৈশাখ)। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ১৮৫৭-১৮৫৯ সালের এই উপমহাদেশের ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল জোয়ান-জনতার 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ'কে যাঁরা সমর্থন করতে পারেন নাই, তাঁরাই পরবর্তীতে নব পরিকল্পনানুযায়ী দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছেন!

www.pathagar.com

ঙ্গে আবার 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে'র কথায় আসা যাক। প্রস্তাবাদি পর গিরিশচন্দ্রের অনুপস্থিতিতেই অর্ধেন্দু শেখর প্রভৃতির উদ্যোগে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের আয়োজন এগিয়ে চলল। 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'কে বিশেষ উৎসাহ যোগাতে লাগলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ, মধ্যস্থ সম্পাদক মনোমোহন বসু এবং ন্যাশনাল পেপার-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তি। মাসিক ৪০ টাকা ভাড়ায় চিৎপুরে একটি বাড়ীর প্রাঙ্গণে স্থাপিত হল রঙ্গমঞ্চ। টিকেটের হার নির্ধারিত হল ঃ প্রথম শ্রেণী ১ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী আট আনা। 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর সেই রঙ্গমঞ্চে উপহার দিল দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণ।' প্রথম অভিনয়ের টিকেট বিক্রির আয় হল চারশ' টাকা। ১২ই ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হল ঃ "গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাটকের অভিনয় কলকাতা শহরে বা মফস্বলেও নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় নহে। খোসপোশাকী বাবুদিগের বৈঠকী সখের অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। নীল দর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কর্ম সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয় সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন। আমরা একান্ত মনে তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। এখন সকলে দেখিতে পারিবে, অভিনয় ক্রিয়া চিরস্থায়িনী হইবে। ...আর এরূপ অভিনয় সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপযুক্ত গ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেন। ভরসা, অচিরাৎ আমরা দুই-একখানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পারিব।"

বাগবাজার-শ্যামবাজারের উৎসাহী যুবকবৃন্দের দ্বারা শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হল বাংলার প্রথম সাধারণ নাট্যশালা—'ন্যাশন্যাল 'থিয়েটার'। 'নীল দর্পণ' নাটকের এই অভিনয় থেকেই প্রমটারের প্রথম প্রচলন হয়। আর একটি বৈশিষ্ট্য ঃ এই অভিনয়ে কোন নারীই নারী চরিত্রে অভিনয় করেননি। অর্থাভাবের জন্যই হয়তো উদ্যোক্তরা অভিনেত্রী সংগ্রহ করতে পারেননি। 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে'র দ্বিতীয় অবদান দীনবন্ধু মিত্রেরই 'সধবার একাদশী'—অভিনীত হয় ২৮শে ডিসেম্বর। ১৮৭৩ সালে ৪ঠা জানুয়ারী অভিনীত হয় একই নাট্যকারের 'নবীন তপস্বিনী'। তারপর ১১ই জানুয়ারীতে ওই দীনবন্ধু মিত্রেরই 'লীলাবতী'। লীলাবতী অভিনয়ের পর থেকে সেখানে সপ্তাহে শনিবার ও বুধবার—এই দুইদিন অভিনয়ের রেওয়াজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

এ-প্রসঙ্গে বলতেই হয়, দীনবন্ধু মিত্রের নিকট বঙ্গীয় ভাবে ঋণী। একে তো তাঁর নাটকাদি ছিল মঞ্চসফল, একাদশী' থেকে 'নবীন তপস্বিনী'—সব ক'টা নাটকই সামা মঞ্চায়নে অন্ততঃ জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য খরচ 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র উদ্যোক্তাদের জন্য এটা ছিল একা পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' লিখেছেন: "নাট্যগুরু স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় শ্রী লয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। মিয়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সা তি নাটকাভিনয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশনাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। এই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।"

www.pathagar.com

পাঁচ/স্থায়িত্বশীল সাধারণ রঙ্গালয়

১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর সাধারণ রঙ্গালয় স্থায়ী হয়ে গেল বলা চলে না। বলা চলে, অন্যের বাড়ির প্রাঙ্গন ভাড়া নিয়ে সাময়িকভাবে নির্মিত মঞ্চে তার শুভ সূচনা হয়েছিল। এ সূচনা বঙ্গীয় নাট্যজগতে এক নবধারার সূচনা। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' দলের অভিনয় খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় এবং তাঁদের অভিনয়ানুষ্ঠানগুলোতে প্রচুর দর্শক সমাগম হওয়ায় দলের তহবিলে অর্থাগমও হয়েছিল যথেষ্ট। আর এতদ্দেশে অর্থের সঙ্গে অনর্থও যে কিছুটা মিশে থাকে এ তো জানা কথাই। 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে'ও সেই অনর্থ দেখা দিল অচিরেই। থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রায় তিনমাস পরেই। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠার প্রায় আড়াই মাস পরে একটি সুকার্যও সম্পন্ন হল। সে কথাটাই আগে বলে নেয়া যাক।

'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' যখন মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' অনিয়ের আয়োজন করে, তখন সমস্যা দেখা দেয় ভীমসিংহের চরিত্র রূপায়ন নিয়ে। এই ভূমিকায় অভিনয় করবেন কে? উপায়ান্তর না দেখে দলের সবাই গিয়ে ধরলেন গিরিশচন্দ্রকে। প্রায় সবারই গুরু নাট্য-শিক্ষক গিরিশচন্দ্র তখন আর কি করেন, সবাই এত করে ধরেছে, তাছাড়া নাটক করার ইচ্ছা মনে মনে যে ষোল আনাই নেই তা তো নয়! রাজী হয়ে গেলেন গিরিশচন্দ্র। কিন্তু কথা থাকল, থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম থাকবে না। তা-ই হল। হ্যাণ্ডবিলে লেখা হল: ভীমসিংহ bya distinguished amateur। যথারীতি 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হল। দলে ফিরে এলেন গিরিশচন্দ্র। তারিখটা ছিল ১৮৭৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী। তার কিছুদিন পরেই বর্ষা এসে গেল। বাড়ির প্রাঙ্গনে তো আর থিয়েটার চলতে পারে না! বন্ধ করে দিতে হল থিয়েটার, অভিনয়ে শেষ রজনীতে যবনিকা পতনের আগে বিহারী-লাল বসু নারীবেশে ফুটলাইটের পেছনে দাঁড়িয়ে গিরিশচন্দ্রেরই রচিত একটি গান গেয়ে দর্শকবৃন্দের কাছে দলের জন্য বিদায় প্রার্থনা করলেন। গানের

www.pathagar.com

শেষাংশ ছিল ঃ "...মম প্রতি ঋতুপতি, হয়েছে নিদয় অতি, হাসাইছে বসুমতি আমারে কাঁদায়। নির্মাইয়ে নাট্যালয়, আরম্ভিব অভিনয়, পুনঃ যেন দেখা হয় এ মিনতি পায়।।" গান শেষ হল। দর্শকবৃন্দ সহানুভূতি জানালেন। সমাপ্ত হল ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের ইতিহাস।

এবার আসা যাক সেই অনর্থের কথায়। তহবিল সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশের ব্যাপার নিয়ে মতভেদ ঘটায় দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একটির নাম রইল 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' অপটির নামকরণ করা হল প্রথমে 'হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার' পরে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার'। অবশেষে, শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যস্থতায় এই মতভেদের অবসান হয় ১৮৭৪ সালের এপ্রিল মাসে। দু'টি ভাঙ্গা দল 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' আবার একদল হয়ে যায়।

ইতিপূর্বে শরৎচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে আর একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপন করেন। বিডন ষ্ট্রিটে তাঁদের নিজস্ব গৃহেই স্থাপিত হয় ওই থিয়েটার। ১৮৭৩ সালের ১৬ই আগষ্ট মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র যাত্রা শুরু হয়। তাছাড়াও ন্যাশন্যাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাস তিনেক পরে 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' নামে আরও একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু তা' বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। 'বেঙ্গল থিয়েটার' মাইকেলেরই পরামর্শ অনুসরণ করে তাঁদের রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীর প্রচলন করেন। এদিকে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল নিজস্ব স্থায়ী রঙ্গালয়ের অভাবে। অবশেষে, ভুবন মোহন নিয়োগী নামক এক ধনী ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে এবং ধর্মদাস সুরের উদ্যোগে বিডন ষ্ট্রিটেই তাঁদের নিজস্ব রঙ্গালয় নির্মিত হয়। ১৮৭৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর নবগোপাল মিত্র স্থাপন করেন এ রঙ্গালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর। ফলে বিডন ষ্ট্রিটে 'বেঙ্গল থিয়েটার' দু'য়েরই স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপিত হওয়ায় বাংলা মঞ্চ-নাট্যের জন্য রঙ্গালয় প্রকৃত প্রস্তাবে স্থায়িত্ব লাভ করে যায়। উল্লেখ্য যে, 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার'ও অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ চালু করেন। এখানে এ-ও উল্লেখযোগ্য যে, তখনকার দিনে ইতিপূর্বেই অনেক যাত্রার দলেই অভিনেত্রীরা অংশগ্রহণ করতেন।

স্থায়ী রঙ্গালয়ে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' ও 'বেঙ্গল থিয়েটার' তো প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু প্রফেশন্যাল থিয়েটার চালাবার মত উপযুক্ত নাটক চাই যে। ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন মারা গেলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং ওই বছরেরই ১লা নভেম্বর মারা গেলেন দীনবন্ধু মিত্র। এই দু'জন প্রথিতযশা নাট্যকারের যে ক'টি নাটক ছিল, সেগুলোর উপর নির্ভর করেই থিয়েটার দু'টি চলল কিছুদিন। কিন্তু একই নাটক তো আর বহুদিন চলতে পারে

www.pathagar.com

না! তাই নাটকের অভাব দেখা দিল প্রচণ্ড রকমে। এই নাট্যাভাবের কিছু-দিন চলল বিভিন্ন কম খ্যাতিমান নাট্যকারের মৌলিক অথবা অনুবাদ-রূপান্তর জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ করে। হরলাল রায়ের 'হেমলতা', 'রুদ্রপাল' (ম্যাকবেথের রূপান্তর) 'শত্রু সংহার' (সংস্কৃত নাটক 'বেনীসংহার' অবলম্বনে রচিত), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া' প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তদুপরি, ওই সময়টায় সাময়িক হুজুগে নাটক ও প্রহসন জাতীয় নাটক-নাটিকাও বেশ কিছু মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু এসবের কোনটাই খাঁটি নাটক হিসাবে রসোত্তীর্ণ ছিল না। আর এই দুর্বলতা ঢাকবার জন্যই এমন সব ব্যাপার নাটকের মধ্যে স্থানলাভ করত যার ফলে তা হয়ে দাঁড়াত নাট্যাকারে নানা অসঙ্গত রসের ও ঘটনার সংমিশ্রণ।

এমনি ধরনের নাটকের এক উদাহরণ দিয়েছেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' নাটক... '...অতি ক্ষুদ্র পরিবার—ছিল তাহাতে মাত্র তিনটি প্রাণী—একটি শিক্ষিত যুবক, তাহার ভগিনী ও এক পালিতা কুমারী। কিন্তু ইহাদিগকেই কেন্দ্র করিয়া নাট্যকার দৃশ্যের পর দৃশ্যে এরূপ রোমাঞ্চকর ঘটনা, রক্তারক্তি কাণ্ড ও দুঃসাহসিক কার্যাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন যে, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না। ইহাতে স্বাধীনতা ও স্বদেশহিতৈষিতা বিষয়ে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা, সাহেবদিগকে গালাগাল, সার্জন ঠেঙ্গান ও গোরাকে গুলি করা, জাল, প্রতারণা, সশস্ত্র ডাকাতি, রাশি রাশি খুন, আত্মহত্যা, বিপ্লবী ষড়যন্ত্র, ভূগর্ভস্থ কারাগার, মানুষ চুরি অত্যাচারী লম্পটের কবল হইতে বন্দিনী ও বিপন্না যুবতীর উদ্ধার...পাহারাওয়ালার বাঁদর নাচ, মাতালদের গান প্রভৃতি কিছুই বাদ পড়ে নাই। বীররস, আদিরস, প্রভৃতি সকল রসেরই একসঙ্গে সমাবেশ ইহাতে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এত কাণ্ডকারখানার পরও নাট্যকার তৃপ্তিলাভ করেন নাই—তিনি গ্রন্থশেষে নায়ক-নায়িকার মিলনের সময় 'পরীস্থান' না দেখাইয়া ছাড়েন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাঙালী গৃহস্থের ঘরে হঠাৎ একদল পরীর আবির্ভাব হওয়া আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থকার করিবেন কি—উপসংহার কালে এই রকম একটা নাচ-গানের ব্যবস্থা না থাকিলে দর্শকগণ যে ক্ষুন্ন হইবেন! সুতরাং পরীরা আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল এবং তৎকালের দেশোদ্ধারকামী দর্শকবৃন্দকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সময়োচিত মিলন সঙ্গীতের পরিবর্তে গাহিল ভারত উদ্ধারের গান। এইরূপে সঙ্গীত পিপাসু ও দেশপ্রেমিক উভয় প্রকার দর্শককেই একসঙ্গে তৃপ্তিদান করিয়া নাট্যকার ধন্য হইলেন।" (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃঃ ৯৭)।

www.pathagar.com

এরকম জোড়াতালিতে যে থিয়েটার বেশীদিন চলতে পারে না, রঙ্গালয়ের পরিচালকবর্গ তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, দর্শকের স্থূল রুচিকে প্রশ্রয় দিয়ে বা সাময়িক হুজুগের সুবিধা গ্রহণ করে নাটক তৈরী করলে তা আপাত আয়বৃদ্ধিকর হলেও পরিণামে অনিষ্টের পথেই পা বাড়ানো হবে। এমনি অবস্থায় তাঁদের চোখ পড়ল বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির উপর। ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়েছে ১৮ ালে। তারপর দশ বছরের মধ্যে বেরিয়েছে কপালকুণ্ডলা, মৃণালিণী, ।ষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর উপন্যাস ।। মাইকেল ও দীনবন্ধুর তিরোধানে নতুন নাটকের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা পূরণ করার জন্য ্যাশন্যাল' ও 'বেঙ্গল' উভয় থিয়েটারই বঙ্কিমের উপন্যাসগুলোর নাট্যরূপ দিয়ে তাঁদের নাট্যক্রিয়া চালিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন। 'ন্যাশন্যাল' মঞ্চস্থ করলেন 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'বেঙ্গল' মঞ্চস্থ করলেন 'দুর্গেশনন্দিনী'। এখানে উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমের প্রায় সবগুলো উপন্যাসই নাটকাকারে অভিনীত হয়েছে এবং বরাবরই সেসব অভিনয় হয়েছে মঞ্চসফল। এত জনপ্রিয়তা অতি অল্প নাটকের ভাগ্যেই ঘটেছে। এমনকি পরবর্তীতে বহু নাটকেই বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্টতঃই প্রতিভাত হয়।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলোর অভিনয়-সাফল্য লক্ষ্য করে পরবর্তীতে নাট্যাকারে রঙ্গালয়ে উপস্থাপিত হয় মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার', নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' ও রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা'। কিন্তু এসবের কোনটাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর জনপ্রিয়তা পায় নাই। মাইকেল ও দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর নাটক যখন ক্রমশই অবনতির পথে গড়িয়ে চলছিল, তখন কিছুদিন বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্য খ্যাতিমানদের উপন্যাস ও কাব্যকৃতিকেই মঞ্চে উপস্থাপিত করে থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছিল। তাও যখন পুরনো হল, তখনই থিয়েটারওয়ালাদের সামনে দেখা দিল এক মহা-সঙ্কট। বাংলা মঞ্চ-নাট্যের এমনি মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই যেন নাট্যকাররূপে আবির্ভূত হলেন অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাট্যকাররূপে গিরিশচন্দ্রই তখন বাংলা মঞ্চ-নাট্যকে দান করলেন এক নব-জীবন। তখনকার বাংলায়, বিশেষ করে কলকাতায়, মঞ্চ-সফল নাটক রচনা করতে হলে সেই নাট্যকারের যে সকল গুণ ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তার সব কটারই পূর্ণ মাত্রায় অধিকারী ছিলেন গিরিশচন্দ্র। তাই তিনি তখনকার দিনে মঞ্চ-সফল নাটক লিখতে পারলেন একের পর এক এবং তাতে করেই প্রফেশন্যাল থিয়েটারে লাগল এসে স্থায়িত্বের ঢেউ। বাংলা মঞ্চ-নাট্যের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের অবদান-কথা অন্য পৃথক প্রবন্ধের আলোচ্য

www.pathagar.com

বিষয়। এ প্রবন্ধে গিরিশ-পূর্ববর্তীকালের নাট্যকার ও নাট্যকর্ম সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া যেতে পারে।

গিরিশ-পূর্ববর্তীকালে অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত সময়টাকে নাট্যপ্রস্তুতির পূর্বকাল, বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পরিচর্যাকাল, বাংলা সামাজিক নাটকের প্রাণ-সন্ধানকাল এবং 'জাতীয়' ভাবৈষণার সূচনাকাল দ্বারা চিহ্নিত বলে ধরে নেয়া যায়। এই কালপরিধিতে বাংলার সামাজিক জীবনে (রাষ্ট্রীয় জীবনে তো বটেই) এসেছে রূপান্তর, পরিবর্তনের ঢেউ, এসেছে দ্বন্দ-সংঘাত। তারপর ক্রমে মসৃণতর পথ দিয়ে চলেছে নবযুগের রথ। ইতিমধ্যে 'জাতীয়' শব্দটাও গ্রহণ করেছে একটা বিশেষ অর্থ। এই অর্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

উনিশ শতকের আরম্ভ থেকেই এদেশে ইংরেজশাসন সংহত ও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল। ১৮২৩ সালে রাজা রামমোহন রায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষার যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আধুনিক যুগ-চেতনার অন্তঃমূলে শক্তি সংযোজনা করেছিলেন। রামমোহন সচেতন ছিলেন হিন্দু জাতির ঐতিহ্য সম্পর্কে, প্রাচীনের প্রতিও ছিল তাঁর শ্রদ্ধাবোধ। তবুও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও জনহিতৈষণাকে তিনি অনুকরণীয় জ্ঞান করেছিলেন। রাজা রামমোহনের পরে বাংলাদেশে নবযুগ রচনার পথিকৃৎ হয়ে দেখা দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা, দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদিক জীবনচর্চা, রাজেন্দ্রলালের ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাসের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বাঙালীর মানস-আকাশে যে বিপুল ভাবৈশ্বর্যের বিস্তৃতি দেখা দিয়েছিল—তার মধ্য দিয়ে প্রাচীন সাহিত্য ও জীবনাদর্শের প্রতি বিশিষ্ট শ্রদ্ধাবোধ দেখা দিল। এই সময়কার বাংলা নাট্য-প্রয়াসের মধ্যেও এই পৌরাণিক অনুসৃতি ও জীবনাদর্শের একটি সুনিষ্ঠ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চ-ব্যবস্থা বা অভিনয়-রীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইংরেজি রীতির আনুগত্য দেখা গেলেও নাট্য নির্বাচনের প্রবণতা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ও পুরাণাশ্রয়ী নাটকাভিনয়ের দিকেই সম্প্রসারিত।" (বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য, ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৬২)। আর এই নবযুগের বিশেষ খাতে প্রবাহিত ভাবধারাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য প্রবাহী করার জন্যই যেন সাহিত্য-সংকৃতির ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এক নবতর চেতনার উজ্জীবন-মন্ত্রের উচ্চারণ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' পুস্তিকায় ১৭৯৫ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে খ্যাত-স্বল্পখ্যাত নাট্যকারদের মধ্য থেকে কিছু-সংখ্যকের নাট্যকৃতির তালিকা দিয়েছেন। তেমন খ্যাতিমান নন এমন অনেকেই

www.pathagar.com

এ তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন। সেই খণ্ডিত তালিকা থেকে দেখা যায়ঃ ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা হচ্ছে ৬, ১৮৫৬ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ১৯, ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত ৮, ১৮৬৬ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত ১৭ এবং ১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ৪১। সর্বমোট নাটকের সংখ্যা ৯১। অন্যভাবে দেখলে ১৮৫৭ সালের পর থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা ৮২। স্পষ্টতঃই, ১৮৫৭ সালের পর নাট্যক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং নাট্যক্রিয়া প্রবাহে যথেষ্ট বেগের সঞ্চার হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে, ১৮৫৭ সাল থেকেই বাংলা মঞ্চ-নাট্যের ক্ষেত্রে সূচিত হয়েছিল এক নতুন যুগ। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকেই এ-বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই ৯১টি নাটকের মধ্যে ইংরেজি নাটকের অনুবাদ হচ্ছে ৪, সংস্কৃত থেকে অনুবাদ বা রূপান্তরের সংখ্যা ৪৭ এবং সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে রচিত নাটক ও প্রহসনাদির সংখ্যা ৪০। উল্লেখ্য যে, ১৭৯৫ সাল পর্যন্ত সময়ের কথা বলা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এই কাল-পরিধিটা হচ্ছে ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত। এর আগে ইংরেজদের অনুকরণে বাঙালীদের দ্বারা ইংরেজি নাটকের অভিনয়াদির তথ্য উপরোক্ত পরিসংখ্যানে নেই। ১৮৫২ থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত এই যে কাল-পরিধি, তাকে বাংলা মঞ্চ-নাট্যের প্রাণ-সন্ধান কাল বলা যায়। এই কালটি কিছু সংখ্যক ইংরেজি নাটকের এবং প্রধানতঃ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বা রূপান্তর, নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর অনুসৃতি এবং সমাজ-সংস্কারমূলক নাট্যকৃতিতে চিহ্নিত।

এরপর আসা যাক নাট্যকারদের কথায়। উপরিউক্ত তালিকায় ৩৪জন নাট্যকারের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ৩৪জন নাট্যকার এই ৯১টি নাটক ওই সময়কালে রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান নাট্যকার ছিলেনঃ রামনারায়ণ তর্করত্ন (জন্মঃ ১৮২২, মৃত্যুঃ ১৮৮৬), তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা ১৩; মাইকেল মধুসূদন দত্ত (জন্মঃ ১৮২৪, মৃত্যুঃ ১৮৭৩), রচিত নাটকের সংখ্যা ৬; দীনবন্ধু মিত্র (জন্মঃ ১৮৩০, মৃত্যুঃ ১৮৭৩) রচিত নাটকের সংখ্যা ৭। এঁরাই হলেন আরম্ভকালের পথিকৃৎ নাট্যকার। এঁদের পরেই স্মরণীয় হচ্ছেনঃ মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২), রচিত নাটকের সংখ্যা ৫, কিন্তু ১৮৭৫ সালের পরেও তিনি আরও ৩টি নাটক লিখেছেন; কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০), রচিত নাটকের সংখ্যা ৪; এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫), ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত নাটকের সংখ্যা ৩, কিন্তু এর পর আরও ৩০টি নাটক রচনা করেন তিনি। ঠাকুর পরিবার থেকে যাঁরা তখন নাটক লিখেছেন, তাঁরা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

www.pathagar.com

ছয়/পরিচয় সন্ধানে বাংলা নাট্যকৃতি

বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পশ্চাৎভূমিতে ক্রিয়াশীল রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রকে নিশ্চিতভাবেই পথিকৃৎ নাট্যকার হিসাবে অভিহিত করা যায়। এঁদের তিনজনেরই নাট্যকৃতির কাল-পরিধি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমাংশে, ১৮৫৪ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত। এ সময়টাতেই বাংলা মঞ্চনাট্য-তরীর পালে জোর বাতাস লাগে। এর আগের সময়টাকে এ সময়টারই প্রস্তুতিকাল বলা যেতে পারে। সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুবাদ 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' (১৮২২), 'হাস্যার্ণব' (১৮২২), 'কৌতুকসর্বস্ব (১৮৩৮), 'রত্নাবলী' (১৮৪৮) থেকে আরম্ভ করে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) হয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' (১৮৫৪) প্রভৃতি নাট্য-প্রয়াস উৎকৃষ্ট নাট্যগুণে চিহ্নিত না হলেও উনিশ শতকের প্রথম দিককার বাঙালী নাট্যামোদীদের ইংরেজি নাটকাভিনয়ের প্রতি মোহমুক্তির স্মারক। মোটামুটিভাবে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের এইসব নাট্য-প্রয়াস সশ্রদ্ধ সহানুভূতির দাবীদার হলেও তা যে অনেকাংশে ছিল অক্ষম প্রয়াস, তা স্বীকার করতেই হবে। তবুও এসব নাট্য-প্রয়াসই মাইকেল-দীনবন্ধুর জন্য রচনা করেছিল রাজপথ না হলেও সুগম এক জনপথ।

এই আলোচনায় প্রথমে পথিকৃৎ ত্রয়ী নাট্যকারের নাট্য সাধনার উপর কিছুটা আলোকপাত করে পরে বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পরিচয় সন্ধানের অনুসরণ করব। তার আগে দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং সামগ্রিক-ভাবে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরতে চাই।

বলা হয়, উনিশ শতকে এদেশে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ এসেছিল। অবশ্যই। কলোনিয়্যাল বলে খুবই পানশে হলেও তা নিশ্চিতভাবেই ছিল এক 'রেনেসাঁ'। তবে সেই ঔপনিবেশিক নবজাগরণে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছিল এই জনপদের

www.pathagar.com

একটা অংশমাত্র, পুরো জন-সমাজটা নয়। জাগ্রত অংশটা থেকে মুসলমানেরা তো বাদ ছিলেনই, হিন্দুদেরও গ্রামীণ বিরাট অংশটাও বাদ ছিল। দেশটা যে পরাধীনতার শেকলে বাঁধা পড়েছিল, বিদেশী শাসন-শিক্ষা-সংস্কৃতির উজ্জ্বলতর যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল যে আপামর জনসাধারণের বহুযুগ-পোষিত ধ্যান-ধারণা, 'জাগ্রত' অংশটা তা স্বার্থ-সুবিধার জন্য বুঝতে না চাইলেও ওই বিরাট বাদ-অংশটা ঠিকই বুঝেছিল। এবং সেই বোধের পথ বেয়েই এসেছিল ১৮৫৭ সালে সিপাহী-জনতার সংগ্রাম, কার্ল মার্কসের মতে 'প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ'। সিপাহী-জনতা হেরে গেল। ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর গোষ্ঠীগত লুণ্ঠনের ক্ষেত্র পরিণত হয়ে গেল সমগ্র বৃটিশ শোষকশ্রেণীর লুণ্ঠন ক্ষেত্রে।

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাটা কেমন ছিল? ডক্টর প্রভাত কুমার গোস্বামীর কথায় (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, কলিকাতা, বাংলা ১৩৮৫, পৃঃ ১৯) ঃ "প্রাচীন কুটির শিল্প মুমূর্ষু, লক্ষ লক্ষ কারিগর বৃত্তিচ্যুত—ফলে জমির উপর প্রচণ্ড চাপ; দেশের বাণিজ্য কয়েকটি বিদেশী এজেন্সী হাউসের দখলে; বিদেশী মূলধনের নিয়োগ হয়েছে নীল চাষে। কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে আধুনিক শিল্প শহর হিসেবে নয়; শহর কলকাতার বাসিন্দা তখনও শ্রমিক, শিল্পপতি নয়; ইউরোপীয় কর্মচারী, ভাগ্যবান বেনিয়া, গৃহ-ভৃত্য, কুলি, পাল্কীবাহক, গাড়ীচালক, পাইকারী ব্যবসায়ী, দিনমজুর এবং 'নব বাবু' ও 'নব বিবি'দের নিয়ে সেদিনের কলকাতা শহর। ...চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন (১৭৯৩) পাস হবার পর সৃষ্টি হয়েছে আধি বা বর্গা প্রথা। জমিদারের পাশাপাশি এক শ্রেণীর জমির মালিকও গড়ে উঠেছে—এদের নাম জোতদার।...ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই জোতদারী প্রথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। চাষের সঙ্গে সম্পর্কহীন জমির উপর নির্ভরশীল একদল মধ্যবিত্ত এইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। ...ঊনবিংশ শতাব্দীর উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর একটি অংশ এসেছিল উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার এবং চাকুরীজীবীদের মধ্য থেকে। সামান্য অবস্থা থেকে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে অনেকে মধ্যবিত্ত সমাজে স্থান লাভ করে নিয়েছিলেন। এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরাই নবজাগরণের নায়ক---বক্তা, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার এদের মধ্যে থেকেই প্রধানত এসেছিলেন।"

বিদেশী শাসকদের ছত্রচ্ছায়ায় গড়ে ওঠা এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটির সঙ্গে প্রচলিত সমাজের দ্বন্দ্ব চলেই আসছিল। ক্রমে রাজশক্তির সঙ্গেও এসে গেল তাঁদের স্বার্থ ও সুবিধাভিত্তিক দ্বন্দ্ব। এই প্রেক্ষাপটেই উপরোক্ত ত্রয়ী নাট্যকারের নাট্য-সাধনা।

www.pathagar.com

নবগঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির মাধ্যমে দেশে যখন হিন্দু-সমাজ সংস্কারের চেতনা যথেষ্ট প্রবল, তখনই কৌলীন্য প্রথাকে আক্রমণ করে সংস্কৃত-শিক্ষিত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনা করেন 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটক। এ নাটকের প্রেরণা ছিল তখনকার দিনে 'আধুনিক' এবং তা ছিল সামাজিকও। কিন্তু রচনারীতি ছিল সংস্কৃত নাটকের অনুগত। তামাশা-কৌতুক, রসাল পরিহাস ও সমাজ-রীতির নানা অসঙ্গতি থেকে হাস্যরস সৃষ্টির যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্বস্ব'র কাহিনী বিন্যাসে কোন বৈচিত্র্য বা মুন্সীয়ানা নেই। কাহিনী-গ্রন্থনাও শিথিল। আঙ্গিকের এসব বিভিন্ন দিকে রামনারায়ণের 'নব-নাটক' বরং উন্নততর। কিন্তু রামনারায়ণের নাটকাবলীর অন্তর্নিহিত সাধু উদ্দেশ্য ও আদর্শ তাঁর নাটকের, বিশেষ করে 'কুলীনকুল সর্বস্ব'র জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তৎকালীন পুরাতন-পন্থী নাট্যকারদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও কৃতী নাট্যকার বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন।

কিন্তু পুরাতন পদ্ধতি ত্যাগ করে পাশ্চাত্য নাট্য-পদ্ধতির অনুসরণে নতুন পথের দুঃসাহসী যাত্রী ছিলেন মধুসূদন ও দীনবন্ধু। দু'জনই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তবে মাত্রাগতভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনেক বেশি। তখন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, দীনবন্ধু মিত্র পুরোপুরি দেশজ সংস্কৃতির মানুষ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্কের ফলে বাঙালীর যে চিত্তমুক্তি ঘটেছিল (বিশেষত উনিশ শতকে), দীনবন্ধু যেন সেই ধারার বাইরে ছিলেন। ধরেই নেয়া হয়েছিল যে, দীনবন্ধু হচ্ছেন ঈশ্বর-গুপ্তেরই উত্তর-সাধক। কিন্তু ডক্টর মিহিরকুমার দাশ তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন (দীনবন্ধু মিত্র : কবি ও নাট্যকার, পিএইচ. ডি. থিসিস, ১৯৬৮): 'দীনবন্ধুও আপন প্রতিভা ও শক্তিতে নবজাগরণের বোধ ও ধারণাকে আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁর সমকালের শ্রেষ্ঠ কবি-ঔপন্যাসিকের মতই বিদেশী ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে তিনিও সংযুক্ত ছিলেন। দীনবন্ধুর কৃতিত্ব যে, তিনি সেই বোধ ও ধারণাকে শুধু আত্মস্থই করেননি, নিজস্ব-রূপে বিশিষ্ট করে নিতে পেরেছিলেন।'

মোহিতলাল মজুমদার দীনবন্ধুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের শক্তি (আধুনিক বাংলা সাহিত্য, মোহিতলাল মজুমদার, ১৯৩৭)। প্রকৃত হিউমারিষ্ট হিসাবে দীনবন্ধু তাঁর নাট্যকৃতিকে হাস্য ও করুণ রসের সংমিশ্রণে ও জীবন্ত ভাষা ব্যবহারে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। কল্পলোকের নয়, বাস্তব জীবনের এমন নিখুঁত ও পরিপূর্ণ চিত্র তাঁর সমকালের অন্য কোন নাট্যকার উপস্থিত করতে পারেননি।

ডক্টর মিহিরকুমার দাশের মতে, উনিশ শতকে বাঙালী সমাজের, বিশেষ

www.pathagar.com

করে ব্রাহ্মধর্মের, সুনীতি-সুরুচির পাশাপাশি এক বলিষ্ঠ আপাত-'অশালীন' চেতনা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। এখনো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সেই চেতনা কাজ করে বলেই তারা নাগরিকদের কাছে 'গ্রাম্য'। বস্তুত মধুসূদনের প্রহসনে, বঙ্কিম-উপন্যাসের অনেক নারী-চরিত্রের কথোপকথনে ও দীনবন্ধুর নাটকে তার প্রকাশ দেখা যায়। মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের সাহিত্যকে অনেকটাই বাস্তব জীবনের অতীত ভাবলোকে স্থাপন করে উচ্চতর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দীনবন্ধুর নাটকে বাঙালীর এই আপাত-'অশালীন' অথচ বলিষ্ঠ সংস্কার নাটকের প্রয়োজনেই উপস্থিত। দীনবন্ধুর নাটককে তাই গ্রাম্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত করার অর্থ সেই বিশেষ কাল ও বৃহত্তর সমাজের সংস্কারকে তথা সমাজের বাস্তবতাকেই অভিযুক্ত করা। কিন্তু উনিশ শতকী জনগণের প্রাণস্পন্দনকে অনুভব করতে গেলে তৎকালীন সমাজের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। রামনারায়ণের মতই দীনবন্ধুরও সাধু উদ্দেশ্য ও আদর্শ এবং বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ততা ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধই হয়তো 'কুলীনকুল সর্বস্ব'র মত 'নীল দর্পণ'কেও দিয়েছিল প্রভূত অভিনয় সাফল্য এবং বিপুল জনপ্রিয়তা।

জীবনাবেগে ভরপুর, পাশ্চাত্য নাট্যরীতির বিশ্বস্ত অনুসারী এবং চির-অধীর মহাকবি মাইকেল মধুসূদন বাংলা মঞ্চ-নাট্যের আকাশে এক ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আগেই উল্লেখিত হয়েছে, নাট্যক্ষেত্রে মধুসূদনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত রামনারায়ণ অনূদিত 'রত্নাবলী'র ইংরেজি অনুবাদ করতে এসে। 'রত্নাবলী'র কোন এক রিহার্স্যালে মধুসূদন বন্ধু গৌরদাস বসাককে বলেছিলেন, এমন একটা অকিঞ্চিৎকর নাট্যকর্মের পেছনে রাজারা এত টাকা খরচ করছেন কেন? উত্তরে গৌরদাস বাংলা ভাষায় ভাল নাটকের অভাবের কথা জানালেন। কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মধুসূদন বলে উঠলেন, "A good play? Why, I will write one myself"। অথচ তখন পর্যন্ত বাংলা ভাষা ভাল করে রপ্তই করেননি মধুসূদন। গৌরদাস বসাকের মুখে আর কথা নেই। কিছুদিনের মধ্যেই মাইকেল রচনা করলেন 'শর্মিষ্ঠা'। সবাই বিস্মিত। বাংলাভাষায় অনভিজ্ঞ মধুসূদন এত চমৎকার নাটক লিখে ফেললেন! রাজাদের দ্বারা বেলগাছিয়া থিয়েটারে তা অভিনীত হল, প্রশংসিত হল এবং রাজাদেরই দ্বারা তা প্রকাশিতও হল। সেটা ১৮৫৯ সালে। মাইকেল তখন উৎসাহে চঞ্চল। তারপর রাজাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই মাইকেল ১৮৬০ সালে রচনা করে ফেললেন দু'টি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। উভয় প্রহসনেই মাইকেল তৎকালীন বঙ্গসমাজের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়কে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বসলেন। পাশ্চাত্য জীবন-ধারার প্রতি 'ইয়ং-বেঙ্গল'

www.pathagar.com

আধুনিকদের আনুগত্যের আতিশয্য ও অমিতাচারকে যেমন বিদ্রূপ করেছিলেন মাইকেল, তেমনি বিদ্রূপ করেছিলেন গোঁড়া হিন্দু সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের ভণ্ডামি ও স্বভাবাচারকে। কিন্তু তা করতে গিয়ে দু'কূলই যেন হারাতে বসলেন মাইকেল। প্রহসন দু'টি প্রশংসিতও হল, কিন্তু বেলগাছিয়া থিয়েটারে কোনটাই অভিনীত হল না।

মাইকেলের স্বদেশবাসী এই জ্যোতিষ্কটির উজ্জ্বল রশ্মি যেন সহ্য-সীমায় ধারণ করতে পারছিলেন না। তাঁর নাটক বেশি বেশি পাশ্চাত্যধর্মী হয়ে যাচ্ছে—এই-ই ছিল বিজ্ঞজনদের উপদেশ। এ সম্পর্কে বন্ধু গৌরদাসকে তিনি লেখেন: "I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my dramas; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care I if there be a foreign air about the thing? ...Don't let thy soul be perturbed, for I promise you a play that will astonish the Pandits," (মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, যোগেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ২৩১-১৩২)।

এখানে উল্লেখ্য যে, মাইকেল ছিলেন প্রকৃত অর্থেই পাশ্চাত্যধর্মী সিকিউলার। উত্তম নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় কাহিনী ও চরিত্রের সন্ধানে ছিলেন তিনি। মাদ্রাজে অবস্থানকালে তিনি ইংরেজিতে 'রিজিয়া' নামক নাট্যকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। 'রিজিয়া' রচনার কারণ হিসাবে তিনি কেশবচন্দ্রকে লিখিত পত্রে উল্লেখ করেন: "We ought to take up Indo-Mussalman subjects. The Mahomedans are a fiercer race than ourselves and would afford splendid opportunity for the display of passions." (মধুসূদনের নাটক, শ্রী ভবানী গোপাল সান্যাল সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃঃ ৬৮)। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজা ও কেশবচন্দ্র এ-জাতীয় পরীক্ষা সমর্থন করেননি। নাট্য রচনায় সিকিউলার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্রও। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে মাইকেল এবং 'নীল দর্পণ'-এ দীনবন্ধু বাস্তবতার দাবী মেটাতেই মুসলমান চরিত্র এঁকেছিলেন। এজন্য দু'জনই যথেষ্ট সমালোচিত হয়েছিলেন এবং এমনটি আর না করতে উপদেশপ্রাপ্তও হয়েছিলেন। সমালোচক ও উপদেষ্টাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নামও অন্তর্ভুক্ত। ততদিনে অবিশ্যি বাঙালী জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়তায় পরিণত হতে চলেছে।

'রিজিয়া'কে নিয়ে মাইকেলের নাটক লেখা আর হল না। তার পরিবর্তে, কেশবচন্দ্রেরই পরামর্শে, রাজপুত জীবন থেকে নাট্যিক উপাদান সংগ্রহ করে

www.pathagar.com

মধুসূদন রচনা করলেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। ১৮৬১ সালে। 'কৃষ্ণকুমারী'ই বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি। অবিশ্যি ইতিপূর্বে রচিত যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) এবং উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬) নাটকও ট্র্যাজেডি; কিন্তু নাটক দু'টিকে সার্থক ট্র্যাজেডি বলা যায় না। তেমনি সার্থক ট্র্যাজেডি বলা যায় না ১৮৬০ সালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'কেও। নাট্যকার মন্মথ রায়ের মতেঃ "..... স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেমের সার্থক রূপায়ণ আমরা পাই ১৮৬১ সালে প্রকাশিত মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে। সুতরাং কৃষ্ণকুমারী নাটককে বাংলার প্রথম দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা দেওয়া অসঙ্গত নয়।" (স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, মন্মথ রায়, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃঃ ৬)। অবিশ্যি 'কৃষ্ণকুমারী' রচনার পেছনে দেশাত্ম-বোধের প্রেরণা যে মুখ্য ছিল, একথা অনেকে মানতে চান না। তাঁরা বলেন, এটি পুরোপুরি সাহিত্য প্রেরণাজাত সৃষ্টি। বেলগাছিয়া থিয়েটারকে কেন্দ্র করেই মাইকেলের নাট্য-সাধনা আরম্ভ হয়েছিল। ওই থিয়েটারের জন্যেই তিনি কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন। তাই তাঁর নাট্যরচনা অনেকাংশেই ওই থিয়েটারের অভিনেতা এবং বিশেষ করে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজাদের মুখাপেক্ষী হয়েই থেকেছে। ডক্টর প্রভাতকুমার গোস্বামীর কথায়ঃ "আপনা থেকে যে নাটক তিনি রচনা করেছেন তা উক্ত মঞ্চে অভিনীত হতে পারেনি। তাঁর 'সুভদ্রা' নাটক অসমাপ্ত থেকে গেছে; প্রহসন দু'টি.....ঐ মঞ্চে অভিনীত হয়নি। ইতিহাস থেকে মুসলমান চরিত্র গ্রহণ করে 'রিজিয়া' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার প্রয়াসও তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ, বেলগাছিয়া নাট্যশালার সমর্থন এতে ছিল না। সুতরাং মঞ্চের প্রয়োজনে এবং মঞ্চের মালিকদের রুচি অনুসারেই মধুসূদনকে নাটক লিখতে হয়েছে।" (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, পৃঃ ৬৪)। যাক, ১৮৬০ সালে মধুসূদন রচনা করছিলেন 'পদ্মাবতী' এবং ১৮৭৩ সালে মৃত্যুর আগে 'মায়াকানন'।

'কৃষ্ণকুমারী' রচনা করতে গিয়ে মাইকেল টড-এর 'রাজস্থান' থেকে কাহিনী আহরণের যে পথ দেখালেন, সেই পথ অনুসরণ করেছেন তাঁর পরবর্তী অনেক নাট্যকারই। তাতে জাতীয়তা সংক্রান্ত বিবেচনায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বেশী করে। আসলে টড-এর 'রাজস্থান' রাজপুত জাতির ইতিহাস নয়। তাঁর গ্রন্থটি হচ্ছে রাজস্থানে তৎকালীন প্রচলিত চারণগীতি এবং মধ্যযুগে রাজস্থানী ভাষায় রচিত কয়েকটি কাব্যের সমন্বয়। এসব দিয়ে যে প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয় না টড সাহেব নিজেও তা জানতেন। তাই তো তাঁর গ্রন্থের নামকরণে History of Rajasthan উল্লেখ না করে উল্লেখ করেছেন Annals and Antiquities of Rajasthan। তুর্কী আক্রমণের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে মেবারের সুদীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী টডের গ্রন্থে অসাধারণ মর্যাদায় স্থান পেয়েছে। আকবরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের সংগ্রামকে টড তুলনা করেছেন সাম্রাজ্যবাদী পারস্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের সংগ্রামের সঙ্গে। পশ্চিম রাজপুতনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক কর্মচারী লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল জেমস টডের উদ্দেশ্য বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডক্টর প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেছেনঃ "……রীতিমত সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই টড ইচ্ছাকৃতভাবেই এটা করেছেন। ……শুধু টড নন, বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা সবাই এইটাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, বৃটিশ শক্তি স্বাধীনতা হারানো রাজপুত জাতি এবং বাঙ্গালী জাতি, এই দুই জাতিকেই চরম অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে। অথচ ১৮১৭-এ রাজপুত রাজ্যগুলিকে এবং আগে ১৭৫৭-এ বঙ্গদেশকে কিভাবে বৃটিশ রাজশক্তি কুক্ষিগত করেছে তা কারও অজানা নেই। এইসব কুকীর্তিকে ঢাকবার জন্যই তারা আমাদের 'মুক্তিদাতা' সেজেছে। ...আমাদের নাট্যকারেরা মোগল রাজপুতের সংগ্রাম কাহিনীর মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই সঙ্গে দুঃখের সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁরা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। আবার জাতীয় আন্দোলন যখন তীব্র হয়েছে, নাটকে তখন হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর বন্যা বয়ে গেছে।" (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, পৃঃ ২৬)।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া ইতিমধ্যেই হিন্দু-মুসলমানের মনে যথেষ্ট কার্যকর হয়ে উঠেছে। মৈত্রীর বন্যা সে ক্রিয়ার উপশম ঘটাতে সক্ষম হয়নি। রাজনৈতিক কারণ বহুবিধ। তা এ প্রবন্ধের বিবেচ্যও নয়। আমাদের বিবেচ্য বাংলা মঞ্চ-নাটক। এক্ষেত্রেও আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা এমনি করে সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত হয়ে গেলাম! নবজাগরণের প্রথম থেকেই সমাজের সেই 'জাগ্রত' অংশটি সাহিত্য-সংস্কৃতি-নাটক প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই তো হিন্দু-হিন্দু করতে আরম্ভ করেছিলেনই, কাল-পরিক্রমায় তা আরও জোরদার হল। মাইকেল দীনবন্ধুর, বিশেষ করে, মাইকেলের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ব্যাহত হল, তাঁদের সদিচ্ছা নিরুৎসাহিত হল। বাংলা নাটক প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ে দাঁড়াল হিন্দু-নাটক। মুসলমানেরাও একাজে এগিয়ে আসেননি। ১৮৭৩ সালে মীর মোশাররফ হোসেন রচনা করেছিলেন 'জমিদার দর্পণ'। কিন্তু সেকালে তা অভিনীত হয়নি কোথাও। কাজেই 'হিন্দু-নাটকেরই' জয়যাত্রা চলতে থাকল বহুদিন ধরে।

———

www.pathagar.com

সাত/বাংলা নাট্যকৃতির প্রতিষ্ঠিত রূপ-পরিচয়

১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'-এর অভিনয় হল যেদিন, বলা চলে সেদিন থেকেই বড় লোকদের বাছাই করা সীমাবদ্ধ দর্শকের গণ্ডি ভেঙে বাংলা মঞ্চ নাটক হতে আরম্ভ করল আপামর দর্শকসাধারণের উপভোগ্য এবং বলতে হয়, তখন থেকেই দর্শকের আবেগ ও রুচির প্রতি প্রফেশন্যাল থিয়েটারকে সতর্ক থাকতে হল। বাংলা নাটকের প্রস্তুতি পর্বে রচিত হয় সমসাময়িক ভাবাদর্শ ও সমাজচিত্র সম্বলিত নাটক প্রহসন। সেই পর্বের নাট্যকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আগেই করা হয়েছে, এবার সেই ভাবাদর্শে সংযোজিত হল কলকাতাভিত্তিক জাতীয় আন্দোলনের চেতনা। এর ভিত্তি রচিত হয়েছিল 'হিন্দু মেলা'য়, ১৮৬৭ সালে। এই চেতনা ক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল নাটকের মধ্যেও। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম দেশ-নায়ক বিপিন চন্দ্র পালের কথায়ঃ "In early years of the seventies of the last century before Surendranath and Anandamohan had organised their platfrom it, was the Bengali stage which had found expression to the new spirit of patriotism among our rising generation of educated intellectuals. It is on this stage that first proclaimed the gospel of the religion of the motherland in an opera." (Memories of My Life and Times, Calcutta, 1932).

যে 'অপেরা'টির কথা বিপিনচন্দ্র উল্লেখ করেছিলেন তার শিরোনাম ছিল 'ভারতমাতা'। এক দৃশ্যের অপেরা। কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৭৩ সালে রচিত। আরম্ভে সূত্রধরের গানঃ 'হে ভ্রাতঃ ভারতবাসী দেখ না চাহিয়ে। পাইতেছ কি যাতনা মোহমদে মাতিয়ে॥' ইত্যাদি। হিমালয় পর্বতে চিন্তামগ্না আলুলায়িতকেশী ভারতমাতা। সম্মুখে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিত। ভারতলক্ষ্মী মঞ্চে প্রবেশ করে গাইলেনঃ 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' এবং 'দেখগো ভারতমাতা তোমারি সন্তান'। তার প্রস্থানের পর

www.pathagar.com

ভারতমাতা উঠে দাঁড়িয়ে নিদ্রিত সন্তানদের লক্ষ্য করে গাইলেনঃ 'উঠ উঠ যাদুমণি কতকাল ঘুমাবে আর?' যাদুমণিরা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, উঠে দাঁড়ায়। তারপর বক্তৃতা ও শেষ গানঃ 'কেন ডর ভীরু কর সাহস আশ্রয়'...ইত্যাদি। গান শেষে যবনিকা।

'ভারতমাতা'র অনুসরণে রচিত হয় আরও আরও নাটক-অপেরা। এসবের মধ্যে হরলাল রায়ের 'হেমলতা' (১৮৭৩) ও 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪) সমধিক প্রসিদ্ধ। 'রাজস্থান' থেকে কাহিনী নিয়ে 'হেমলতা' এবং বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাহিনী নিয়ে 'বঙ্গের সুখাবসান'। অতঃপর দেশপ্রেম জাগ্রত করার জন্য ইতিহাসকে উদ্দেশ্য অনুসারী করে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ রচনা করলেন জমজমাট 'ঐতিহাসিক' নাটকঃ পুরুবিক্রম (১৮৭৪), সরোজিনী (১৮৭৫), অশ্রুমতী (১৮৭৯) এবং স্বপ্নময়ী (১৮৮২)। 'পুরুবিক্রম'-এ আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে হিন্দুরাজা পুরুর বিক্রম, 'সরোজিনী'তে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজীর বিরুদ্ধে রাজা লক্ষ্মণ সিংহের বীরত্ব, 'অশ্রুমতী'তে আকবরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপ ও 'স্বপ্নময়ী'তে আওরঙজেবের বিরুদ্ধে শুভ সিংহের বীরত্ব গাথা আবেগের সঙ্গে বিধৃত। ভারতের লাঞ্ছনার জন্য দায়ী কিন্তু তখন বিদেশী ইংরেজ শাসন। অথচ নাটকে যেন ইংরেজ শাসকদেরই প্রক্সি দেওয়ানো হচ্ছে মুসলিম রাজন্যবর্গদের দিয়ে। ওই সময়টায় শুধু জ্যোতিরিন্দ্র নাথ নন, প্রায় সকল নাট্যকারই তাঁদের 'ঐতিহাসিক' নাটকে ওই কৌশলটির আশ্রয় নিচ্ছেন। কচু অথবা কলাগাছ কেটে হাত পাকানোর মতই। তাতে করে ইংরেজদের রোষানলকে এড়িয়ে যাওয়া গেল, স্বদেশবাসীর 'দেশাত্মবোধ'ও জাগ্রত করা গেল। হাত বেশ পাকা হল যখন, তখন সরাসরি ইংরেজই এসে গেল নাটকে। এবং এমনি করে, নাট্যানুষ্ঠান যখন প্রচণ্ড ইংরেজ-বিরোধী রূপ নিল, তখনই দেখা দিল ১৮৭৬ সালের সেই নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন। এই আইনটি পাস হওয়ার পেছনে একটা পটভূমি আছে। সেটা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে।

'নীল দর্পণ'-এ ইংরেজ রোগ সাহেবকে তথা ইংরেজগণকে যে যথেষ্ট হেয় ও ঘৃণ্য করে দেখানো হয়েছিল এতো সবারই জানা। 'নীল দর্পণ' -এর প্রথম অভিনয়ের পরেই এই হেয় ও ঘৃণ্য করার ব্যাপারাদি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়। খাপ্পা হয়ে ওঠেন কর্তৃপক্ষ। তারপর মানহানিকর অংশ বাদ দিয়ে 'নীল দর্পণ' অভিনীত হতে থাকে। 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে'র সেক্রেটারী কর্তৃপক্ষকে পত্র লিখে জানান যে, 'নীল দর্পণ' অভিনয়ের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনের চিত্র দেখানো, ইংরেজদিগকে বিদ্রূপ করা নয়। ইংরেজদের প্রতি তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। ইত্যাদি। কিন্তু কথায় কি-

www.pathagar.com

ভাবি ভোলে ? The Englishman পত্রিকা 'নীল দর্পণ'-এর অভিনয় বন্ধের দাবী জানান। Indian Daily News-ও একই দাবী তোলেন। এ নিয়ে মামলা মোকদ্দমাও হয়ে যায়। এদেশীয় নীতিবাগীশেরা তো নাটকের উপর আগে থেকেই খড়্গহস্ত ছিলেন। এবার তারাও মওকা পেলেন। ১৮৭৩ সালের ১৬ই আগষ্ট 'ভারত সংস্কারক' লিখলেনঃ 'এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাৎ, কীর্তন, ঝুমুরেই কেবল বেস্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেস্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম।' কোন কোন পত্রিকায় নাট্যশালা ধ্বংস করে দিয়ে তার আসবাবপত্র নিলামে ওঠাবার দাবীও জানানো হয়েছিল। এসব কথা কর্তৃপক্ষের মনে স্বাভাবিকভাবেই গেঁথে রইল।

ইতিমধ্যে গ্রেট বৃটেনের যুবরাজ এডওয়ার্ড (পরে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড) রাজধানী কলকাতায় তশরিফ আনলেন। ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বরে। 'রেনেসাঁ'য় নবজাগ্রতদের মোহমুক্তি ততদিনে অনেকটা ঘটে গেছে। তাঁদের ইংরেজ-ভক্তিতে ভাটার টান লেগেছে। তার উপর যুবরাজ্যের অভ্যর্থনার ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্তৃপক্ষ এক রকম জোর-জবরদস্তি করেই বিত্তবানদের কাছ থেকে টাকাকড়ি আদায় করেছিলেন। ট্যাকে হাত পড়ায় অনেকেই ছিলেন ক্ষুব্ধ। শিক্ষিত সমাজের অনেকের মধ্যেই অভ্যর্থনার জন্য উৎসাহের অভাব। তবুও অভ্যর্থনা কার্য সম্পন্ন হল। এদিকে কলকাতার ভবানীপুরের খ্যাতনামা উকিল ও সরকারের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে নেমন্তন্ন করে একেবারে নিজের প্যালেসে নিয়ে গেলেন। শুধু তা-ই নয়, হিন্দু প্রথামত কুলমহিলাদের দিয়ে ইংরেজ যুবরাজকে ধানদূর্বা সহকারে বরণ করালেন। ব্যস, কলকাতার সমাজে সৃষ্টি হল দারুণ প্রতিক্রিয়া। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখলেনঃ Nationl feeling has been outraged। থিয়েটারওয়ালারাও এই সেন্টিমেন্ট কাজে লাগাতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ন্যাশন্যাল থিয়েটার জগদানন্দকে বিদ্রূপ করে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামে প্রহসন মঞ্চস্থ করে বসলেন। সেটা ১৮৭৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী। সরকার অর্ডিনান্স জারি করে এর দ্বিতীয় অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। উদ্যোক্তারা দমলেন না। 'হনুমান চরিত' নাম দিয়ে প্রহসনটি ২৬শে ফেব্রুয়ারী আবার তারা মঞ্চস্থ করলেন। এবারেও পুলিশ বন্ধ করে দিল এর পুনরাভিনয়। আবার রচিত হল নতুন প্রহসন—নাম Police of Pig and Sheep। এবার বিদ্রূপের লক্ষ্য পুলিশের কমিশনার ও সুপারিনটেন্ডেন্ট। প্রহসনটির অভিনয় বন্ধ করে দিল পুলিশ।

সরকার যথাকর্তব্য স্থির করে ফেললেন। ১৮৭৬ সালের ১লা মার্চ Indian Mirror পত্রিকায় খবর বেরুলঃ " A gazette of India

www.pathagar.com

extraordinary was issued last evening containing an ordinance to empower the government of Bengal to prohibit certain dramatic performances which are scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to the public interest. . ."। দেশবাসীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসেই Dramatic Performance Control Bill নামে আইনের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করা হল এবং ১৬ই ডিসেম্বর তা আইনে পরিণত হল। শিরোনামে থাকল ঃ Act No. XIX of 1876 [16th December 1876]. AN ACT FOR THE BETTER CONTROL OF PUBLIC DRAMATIC PERFORMANCES, তারপর আইনের ১২টি ধারা। শেষের ১২ নং ধারায় থাকল ঃ Nothing in this Act applies to any Jatras or Performances of a like kind at religious festivals। আইনের বলে নির্দেশিত হল ঃ পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন নাট্যানুষ্ঠান হতে পারবে না। অর্থাৎ নাট্যশিল্পের বিচারকের আসনে এসে উপবিষ্ট হল পুলিশ।

নাট্যাঙ্গনের অবস্থা তখন? সরকারের আইন যখন, কি আর করা যায়! ভাটা পড়ে গেল নাটকে জাতীয় উত্তেজনা প্রকাশে। ডক্টর প্রভাতকুমার গোস্বামী বলেন, ".....লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ১৮৭২-৭৬ এই চার বছর বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ জাতীয়তাবাদের জয়ধ্বনিতে যেমন মুখর, ১৮৭৬ - ১৯০৩ এই বছরগুলি তেমন মুখর নয়।" (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক. পৃঃ ১০৬)। উল্লেখ্য, ১৮৭৬ - ১৯০৩ এই কালটিই মোটামুটিভাবে গিরিশচন্দ্রের নাট্যকৃতির কাল। ডক্টর গোস্বামীর কথাতেই, "যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'পুরুবিক্রম'-এ জাতীয়তায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন 'সরোজিনী'র পরেই তা ক্ষীয়মাণ হলো এবং শেষে গিরিশচন্দ্রের উপর নাট্যরচনার ভার অর্পণ করে তিনি সরে গেলেন।" (পৃঃ ১১৩)।

গিরিশচন্দ্র নিজ দায়িত্ব সফলভাবেই পালন করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, ১৮৭৩ সালে মাইকেল - দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর বাংলা মঞ্চ-নাট্যের ক্ষেত্রে যে শূন্যতা দেখা দেয়, গিরিশচন্দ্র সেই শূন্যতা শুধু পূরণই করলেন না, বাংলা নাটককে এক শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে সূচনা করলেন এক নতুন যুগের। পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণাঢ্যতা, রোমান্স ও ভক্তির প্লাবনে বাংলা রঙ্গমঞ্চ তিনি প্লাবিত করে দিলেন। সামাজিক নাটককেও তিনি করে তুললেন মর্মস্পর্শী ও আকর্ষণীয়। পাশ্চাত্য আবরণ গায়ে চড়িয়ে বাংলা মঞ্চ-নাটক হয়ে দাঁড়াল হিন্দু বাঙালীর মানসোপযোগী, তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক মঞ্চ-সফল নাট্যকৃতি। বাংলা নাট্য পরিক্রমার

www.pathagar.com

এতদিনকার পায়ে চলা সরু ও বন্ধুর পথটা হয়ে দাঁড়াল রাজপথ না হলেও প্রশস্ত সুগম এক জনপথ।

১৮৬৭ সালে গিরিশচন্দ্র বাগবাজার সখের যাত্রাদলে যোগদান করেন। তারপর ১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাগবাজার এমেচার থিয়েটার দলে। এসব দলে থাকার অর্থ সমবয়স্ক তরুণেরা মিলে দলগঠন করা। তারপর তো ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কথা। এমেচার থিয়েটার যখন 'ন্যাশন্যাল' নাম নিয়ে টিকেট বিক্রি করে থিয়েটার করতে এগোয়, তখন গিরিশচন্দ্র দল ছেড়ে চলে যান। একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ১৮৭৩ সালে 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' যখন 'কৃষ্ণকুমারী' মঞ্চস্থ করতে যায়, তখন সাথী-শিল্পীদের অনুরোধে এমেচার শিল্পী হিসাবে ভীমসিংহের চরিত্রে রূপদান করেন গিরিশচন্দ্র। ১৮৭৪-এ পুরোপুরিই যোগ দিলেন 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার'-এ। তখনও তিনি প্রধানত অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর নাট্যকার জীবন শুরু হয় ১৮৮১ সাল থেকে। ওই বছর তিনি রচনা করেন তাঁর প্রথম প্রতীক গীতিনাট্য 'মায়াতরু' এবং সে বছরই তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দ রহো'। এর পর থেকে ১৯১২ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অবিরাম লিখে চলেন নানা জাতীয় নাটক। গিরিশচন্দ্র পুরাদস্তুর নট ও নাট্যকার হলেন ঘটনাচক্রে।

১৮৭৯ সালে 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নিলামে উঠলে তা কিনে নেন প্রতাপচাঁদ জহুরী নামক এক মড়োয়ারী ব্যবসাদার। নাট্যশিল্পের উন্নয়ন মানসে নয়, ব্যবসায়িক বুদ্ধি থেকেই তিনি তা কিনেছিলেন এবং সে-ব্যবসা তিনি জাঁকিয়েও তুলেছিলেন। প্রফেশন্যাল থিয়েটারের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতাপ জহুরীর এ পদক্ষেপও যথেষ্ট কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। থিয়েটার কিনেই প্রতাপচাঁদ জহুরী গিরিশচন্দ্রকে নাছোড়বান্দার মত গিয়ে ধরলেন। এতদিন পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র সওদাগরী অফিসে চাকুরি করতেন আর সখের নাটকও করতেন। চাকুরি করতেন পার্কার কোম্পানীতে, মাসে দেড়শ' টাকা মাইনে। প্রতাপচাঁদ ধরে বসলেন ঃ গিরিশচন্দ্রকে চাকুরি ত্যাগ করে তার থিয়েটারে চাকুরি নিতে হবে। এতদিন দুই নৌকায় পা ছিল গিরিশচন্দ্রের। এইবার এক নৌকারই যাত্রী হয়ে তাঁকে জীবন-নদীতে পাড়ি জমাতে হবে। অনেক চিন্তা-ভাবনার শেষে জয় হল থিয়েটারের। মাসে একশ' টাকা মাইনেতে তিনি যোগ দিলেন থিয়েটারে, প্রতাপচাঁদের ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অধ্যক্ষরূপে। 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' চলতে থাকে। প্রফেশন্যাল ভিত্তিতে চলতে থাকে অন্যান্য থিয়েটারও। বলতে কি, সে চলা আজও পর্যন্ত বজায় আছে। থিয়েটারের মালিকানায় হাত বদল হয়, নামও বদল হয়। কিন্তু থিয়েটার চলে। গিরিশচন্দ্রও অন্যান্যের মত থিয়েটার বদলেছেন।

www.pathagar.com

১৮৮০ থেকে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন 'ষ্টার থিয়েটার'-এ। ১৮৮৮ সালেও সেখানেই, কিন্তু 'ষ্টার থিয়েটার' তখন নাম বদলে হয়েছে 'এমারেল্ড থিয়েটার'। তারপর ১৮৮৯ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত হাতীবাগানের 'ষ্টার'-এ, ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত 'মিনার্ভা থিয়েটার'-এ, ১৮৯৬ থেকে ১৮৯৮ পর্যন্ত আবার 'ষ্টার'-এ, ১৮৯৮-এর শেষ দিকে 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ। ১৯০০ সালে আবার 'মিনার্ভা'য়, ১৯০১ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত আবার 'ক্লাসিক থিয়েটার'-এ এবং ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত আবার 'মিনার্ভায়'। মোট নাট্য জীবন ৪৫ বছরের।

এ সব থিয়েটারে তিনিই ছিলেন একাধারে প্রধান অভিনেতা, নির্দেশক, নাট্যশিক্ষক, নাট্যকার ও থিয়েটারের অধ্যক্ষ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথায়ঃ 'দেখিতে দেখিতে গিরিশ বাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিল'। নাট্য রচনা থেকে আরম্ভ করে তাঁর নির্দেশনা, প্রযোজনা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাসহ নাট্যানুষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগে থাকত তাঁর অবদানের স্বাক্ষর। আজ থেকে শতাধিক বর্ষ আগে অত্যন্ত সীমিত বস্তুসম্ভার, অনভিজ্ঞ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও আনাড়ী কলাকুশলী নিয়ে হয়েছিল তাঁর যাত্রা শুরু। জীবনের শেষে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হল যে, সেটা ছিল তাঁর জয়যাত্রা।

পুরা কাহিনীতে আছে, ঋষির অভিশাপে ভস্মীভূত হয়ে যায় সগর রাজার ষাট হাজার সন্তান। বেঁচে থাকেন মাত্র এক পৌত্র ভগীরথ। পিতৃপুরুষদের পুনরুজ্জীবিত করার জন্য স্বর্গলোক থেকে গঙ্গাদেবীকে মর্তে আনার মানসে ভগীরথ আরম্ভ করেন কঠোর সাধনা। অবশেষে সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী গঙ্গা আগমন করেন মর্তে। প্রাণ-গঙ্গার পরশে ষাট হাজার সগর-সন্তান আবার প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠে। এটা সম্ভব হয়েছিল ভগীরথেরই কঠোর সাধনার ফলে। মাইকেল-দীনবন্ধুর তিরোধানে বাংলা মঞ্চ-নাট্যও হয়ে পড়েছিল প্রাণহীন। আর তাতে প্রাণ সঞ্চারের জন্যই যেন নাট্য-সাধনায় রত হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র এবং সফলও হয়েছিলেন সে-কাজে। গিরিশচন্দ্র তাই বাংলা মঞ্চ-নাট্যের ভগীরথ-সাধক।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র গিরিশচন্দ্রই, মাইকেল নন। মাইকেলের নাট্য-স্বপ্ন ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে সিকিউলার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ আহরণ করে তারই আলোকে ও দৃষ্টান্তে নানা বর্ণে, নানা রসে তিনি উজ্জীবিত ও উন্নীত করতে চেয়েছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এবং সেই সঙ্গে বাংলা নাট্যকৃতিকেও। হিন্দু-জাতীয়তার গন্ডি তিনি ডিঙিয়ে গিয়েছিলেন। নিজ প্রতিভা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সজাগ-প্রত্যয়ী। বিশ্বাস করতেন, উত্তম বলেই দর্শকবৃন্দ তাঁর অবদান গ্রহণ করবেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস

www.pathagar.com

করতেন, দর্শকবৃন্দের মানস ও রুচিকে পরিতৃপ্ত করতে না পারলে নাট্য প্রয়াস হবে অনাদৃত অর্থহীন। এবং দর্শকসাধারণ যেহেতু হিন্দু জাতীয়তা ও ধর্মীয় ঐতিহ্য-মমতায় ইতিমধ্যেই উদ্বুদ্ধ, তাঁর নাট্যসাধনাও তাই নিবেদিত ছিল তারই জয়গানে। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন গিরিশচন্দ্রও। কিন্তু সে পরিচিতির সকল আহরণ দিয়ে তিনি ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর নিষ্ঠাকেই সুন্দরতর করে প্রকাশ করেছেন। ফলে, হিন্দু নাটককে দৃঢ় ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন গিরিশচন্দ্র। পৌরাণিক নাটকের সপক্ষে বলতে গিয়ে তিনি বলেন: "জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম—ধর্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হল সঞ্চালনা করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণ নাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে। ইংরেজী ভাবে, বিদেশীয় ভানে যাহারা সেই ভান করেন (তাঁহারা সেই ভানের মর্ম বোঝেন না), সেই ভানে জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না। ...হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে। এই মর্মাশ্রিত ধর্ম, বিদেশীর ভীষণ তরবারি-ধারে উচ্ছেদ হয় নাই। আকবরের রাজনৈতিক প্রভাবেও সমভাবে আছে।" (রঙ্গালয়—সাপ্তাহিক পত্রিকা, ২০শে চৈত্র, ১২০৭ সন: প্রবোধবন্ধু অধিকারী সম্পাদিত 'গিরিশচন্দ্রের নাট্যচিন্তা' ১৯৭৮ থেকে উদ্ধৃত)।

এখানে উল্লেখ্য, গিরিশচন্দ্রের নাট্যকৃতির সময়টা ছিল নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের নিগড়ে বাঁধা। তাই 'ঐতিহাসিক' নাটকের পথ আর না মাড়িয়ে পৌরাণিক নাটকের প্রতিই মনোনিবেশ করেছিলেন বেশি করে। কয়েকটি 'ঐতিহাসিক' নাটকও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু সেগুলোও ছিল তৎকালীন অন্যদের মনগড়া 'ঐতিহাসিক' নাটকের মতই বিশেষ মতানুসারী। তাঁর 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' নাটকের অভিনয় নিয়ে কেলেঙ্কারিও হয়েছিল যথেষ্ট। ডক্টর প্রভাতকুমার গোস্বামীর কথায়: "এই নাটকে স্বদেশ-প্রেমের প্রবল তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোড়কে পরিবেশিত হওয়ায় তার মধ্য থেকে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প উদগীরিত হয়েছে। ...বৈষ্ণবী সোজাসুজি মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত করছে। ...এই শ্রেণীর নাটক হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির সহায়ক হয়নি; বরং দিনের পর দিন মঞ্চে অভিনীত হয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে

www.pathagar.com

বৈরিতারই সঞ্চার করেছে।" (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, পৃঃ ১১৭-১১৮)। এই নাটকের অভিনয় নিয়ে কলকাতার মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদও জানানো হয়েছিল। "গিরিশ বাবুর সৎনাম মহা-নাটক লইয়া গত শনিবার ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। মুসলমানের কুৎসাপূর্ণ নাটক অভিনয় করিতে দিব না বলিয়া কলিকাতা শহরের ২/৩ সহস্র মুসলমান ক্লাসিক থিয়েটারের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিলেন, শহরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, নাটক অভিনয় বন্ধও হইয়াছিল।" (মিহির ও সুধাকর, ২৭শে মে, ১৯০৪)। অবিশ্যি এ জাতীয় মনোবৃত্তির জন্য গিরিশচন্দ্রকে আলাদাভাবে দায়ী করা যায় না। 'সৎনামে' তিনি ওই সময়কার দর্শকসাধারণের প্রচলিত চাহিদাই পূরণ করতে চেয়েছিলেন।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে, যে সময়কার কথা বলা হচ্ছে তখন নাট্যকারেরা আপন ইচ্ছায় নাটক লিখতে পারতেন না। তাঁদেরকে রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষের রুচিমাফিক নাটক লিখতে হত। গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে এই বাধা তো ছিলই, মাইকেলের সম্মুখেও ছিল। আপন ইচ্ছায় মাইকেল 'রিজিয়া' নাটক লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালার কর্তৃপক্ষের সমর্থন তাতে ছিল না। অগত্যা 'রিজিয়া' রচনার ইচ্ছা বাদ দিয়ে টডের 'রাজস্থান' থেকে কাহিনী আহরণ করে মাইকেল রচনা করলেন 'কৃষ্ণকুমারী'। কিন্তু রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটার তাও মঞ্চস্থ করল না। রাজাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েই মাইকেল একের পর এক দুটি প্রহসন লিখলেন। তাও অভিনীত হল না সেখানে। অথচ বেলগাছিয়া থিয়েটার ব্যবসায়ী নাট্যশালা ছিল না! এই না হওয়ার সম্ভাব্য কারণ তো এই যে, বেলগাছিয়া থিয়েটারের বিশিষ্ট দর্শকেরাও ও-জাতীয় নাটক পছন্দ করতেন না।

আর গিরিশচন্দ্র তো মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের হয়েই নাটক লিখতে আরম্ভ করেন। প্রতাপচাঁদ জহুরীর চাকুরি নিয়েই থিয়েটারের জন্য তাঁর নাট্যকার জীবনের শুরু। নাট্যকার, নাট্যাচার্য ও নাট্যালয়-অধ্যক্ষ হিসাবে গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হল প্রতাপচাঁদের থিয়েটারেই। নাটক তখন পুরোপুরি ব্যবসাভিত্তিক। সুতরাং নাট্যশালায় টাকা লগ্নীর দিকটাকে বিবেচনায় এনে গিরিশচন্দ্রকে নাটক লিখতে হত। নাটকে কি বক্তব্য থাকলে দর্শকবৃন্দের বাহবা মিলবে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হত। দর্শকদের মানস ও রুচিতে তখন সাম্প্রদায়িকতা ক্রিয়াশীল। তাই তো 'সৎনাম' নাটকও লিখতে হল গিরিশচন্দ্রকে।

———

www.pathagar.com

আর্ট/রেনেসাঁ নয়, পুনরুজ্জীবন

প্রশ্ন উঠতে পারে, 'রেনেসাঁ'র নবালোকপ্রাপ্ত হয়েও বঙ্গদেশীয় ইংরেজি শিক্ষিত গুণীজনেরা দর্শকসাধারণকে নবালোকিত রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস ছেড়ে পুরোপুরিভাবে তাদের দ্বারাই চালিত হলেন কেন? নাট্যকারেরা কি শুধুমাত্র নাটকের যোগানদার? দর্শকেরা যেমনটি চাইবেন, তেমন নাটকই হাজির করবেন? অথবা অন্য কিছু? উত্তরের জন্য সেই রেনেসাঁর কথাতেই ফিরে যেতে হবে।

ইউরোপে পনের শতকের মাঝামাঝি সময়টায় রেনেসাঁর শুরু। ১৪৫৩ সালে তুর্কীদের হাতে কনস্তান্তিনোপলের পতনের পর ওই এলাকার গ্রীক-রোমান পণ্ডিতেরা দেশ ছেড়ে প্রথমে ইতালী, পরে দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের আসবার আগে ধর্মীয়ভাবে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের গোঁড়ামির আধিপত্যে ওইসব দেশে মানুষের জীবনের বিকাশ ছিল রুদ্ধ। স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি লাঞ্ছিত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সংকুচিত। আগত পণ্ডিতেরা নিয়ে এলেন দর্শন-সাহিত্য-শিল্পরূপের এক উন্নত মানবতাবাদী আদর্শ। তারই প্রভাবে মধ্যযুগীয় গোঁড়ামির নিগড়ে বাঁধা, খৃষ্টান রক্ষণশীলতার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল জ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা, বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল এবং দর্শন-সাহিত্য-শিল্পরূপের প্রতি বাস্তবোন্মুখী আগ্রহ। ক্রমে এক নবজীবনের পথে এগিয়ে চলল ইউরোপ। এই নবজীবনের জন্য রেনেসাঁ বা নবজাগৃতির বিকাশ চলল প্রায় শ'খানেক বর্ষ ধরে। ষোল শতকের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করে এই নবজাগরণের বিকাশ সবচেয়ে বেশি ঘটল ইংল্যান্ডে। ১৫৫৮ সালে স্পেনিশ আর্মাডার পরাজয়ের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের যে বিজয়, তা-ই পূর্ণভাবে ইংল্যান্ডবাসীর হৃদয়ে বিকশিত করে দিল এক আত্মগর্বী জাতীয়তাবোধ যার চেতনায় ইংল্যান্ড তখন অধীর চঞ্চল। অভ্যুদয় ঘটল আত্মবিশ্বাসে বলিষ্ঠ এক দুর্বার বিজয়োল্লাসী ইংরেজ জাতির, যে-জাতি সম্পদ আহরণে দুঃসাহসী অভিযাত্রী, বাণিজ্যে সুচতুর আর যৌবন গরিমায় অদ্বিতীয়।

www.pathagar.com

এই সময়কালে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় ইংল্যাণ্ডে সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী বা বণিক-বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হল এক বৈপ্লবিক আন্দোলন যার ফলে ক্রমে ধসে পড়ল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভিত। প্রতিষ্ঠিত হল বণিক-বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্য। এই আন্দোলনে সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় আবদ্ধ কৃষক তথা উৎপাদন-সংলগ্ন সাধারণ মানুষ ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীটির প্রধান সহযোগী শক্তি।

আর এতদ্দেশের নবজাগরণ? শুরু তার পরাধীনতার সুদৃঢ় বন্ধনে। এখানকার রাজশক্তিকে নাস্তানাবুদ করে বিদেশী বণিক-বুর্জোয়া আধিপত্য যখন প্রতিষ্ঠিত হল এদেশে, তখনই পুরনো সামন্তদের সাথে দেশীয় বণিক শ্রেণীটিও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার পরিবর্তে নতুন ভূমি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হল এক নতুন অভিজাত জমিদার গোষ্ঠী ও মধ্যস্বত্ব-ভোগী এক মধ্য শ্রেণী। এই মধ্য শ্রেণীর আর একটি অংশ হল পাশ্চাত্য শিক্ষায় নব্য-শিক্ষিত চাকুরিজীবিগণ। উল্লেখ্য, প্রধানত এই অংশটি থেকেই উদ্ভব ঘটেছিল তৎকালীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের—কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার-সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতির। তৎকালীন দেশবাসীকে যদি দুটি ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে একভাগে থাকবে নবসৃষ্ট জমিদারগোষ্ঠী এবং নব্য-শিক্ষিত চাকুরিজীবিগণসহ ভূমির মধ্যস্বত্বভোগী মধ্য শ্রেণীটি, আর অন্য ভাগে বিভিন্ন স্তরের কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়।

প্রথমোক্ত এই অভিজাত ও মধ্য শ্রেণীটি শাসক গোষ্ঠীর প্রসাদ-পুষ্ট হয়ে বঙ্গীয় সমাজের শীর্ষে আরোহণ করেন। লাভ করেন সমাজের উপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব। কিন্তু সামাজিক নেতৃত্ব লাভের প্রচেষ্টায় তাঁরা বাধাপ্রাপ্ত হন রক্ষণশীল হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণদের সর্বব্যাপী সামাজিক প্রভুত্বের দ্বারা। তৎকালে এই ব্রাহ্মণ্য নাগপাশে আবদ্ধ বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। "সমাজের এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকামী নূতন অভিজাত শ্রেণীটি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ ঘোষিত হয় প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে, প্রচলিত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, প্রচলিত সাহিত্যের বিরুদ্ধে, প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহেরই ফলস্বরূপ আমরা লাভ করিয়াছি নূতন ধর্ম (ব্রাহ্মধর্ম ও নবহিন্দুবাদ), নূতন শিক্ষা, নূতন সাহিত্য, নূতন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতি এবং 'সতীদাহ' নামক পাশবিক সামাজিক রীতির উচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন।--এই সকল সমাজ-সংস্কারমূলক ক্রিয়াকলাপই সমগ্রভাবে য়ুরোপীয় 'রিনাসান্সে'র অনুকরণে বঙ্গীয় 'রিনাসান্স' বা বাঙলার 'নবজাগৃতি' নামে অভিহিত হইয়া

www.pathagar.com

থাকে। বঙ্গীয় 'রিনাসান্সে'র এই সকল সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল এবং 'রিনাসান্সে'র নায়কগণের আপেক্ষিক প্রগতিশীলতাও অনস্বীকার্য। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইতে উদ্ভূত ভূস্বামী-শ্রেণীর অপর অংশ ছিল এই সংস্কারপন্থী ভূস্বামীগণ অপেক্ষা শতগুণ অধিক রক্ষণশীল।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়, ১৯৭২, পৃঃ ১৫৩-১৫৪)।

কিন্তু উপরোক্ত 'রেনেসাঁ'পন্থী ও রক্ষণশীল মধ্য শ্রেণীর এই উভয় অংশই ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি সমান মোহাচ্ছন্ন ও আস্থাশীল। নবসৃষ্ট জমিদারেরা তো ইংরেজ-ভক্ত ছিলেনই। মধ্য শ্রেণীটির রক্ষণশীল অংশ কোম্পানী শাসনকে সমর্থন করত তাদের সৃষ্টিকারী ও রক্ষক বলে। আর প্রগতিশীল অংশটি সমর্থন করত কোম্পানী প্রবর্তিত উন্নত ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক বলে। মুসলমানদের কথা এদের কেউই বিবেচনায়ই আনতেন না। তাই দেখা যায়, বঙ্গবাসীর অপর অংশটি অর্থাৎ ভূমি সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ ও কারিগর সম্প্রদায় যখন কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে, তখন জমিদার শ্রেণীটি তো বটেই মধ্যস্বত্বভোগীটিরও উভয় অংশই বিদেশী শাসনের সপক্ষে ওইসব প্রতিরোধ প্রচেষ্টা বা বিদ্রোহের প্রতি বিরূপতা প্রকাশ করছে।

বৃটিশ বণিক-বুর্জোয়ারা নিজেদের দেশে গণতান্ত্রিকতার সমর্থক হলেও এই উপনিবেশটিতে তাদের ভূমিকা ছিল সাদামাঠা সাম্রাজ্যবাদী শোষকের ভূমিকা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মারফত তারা এদেশীয় পুরাতন সমাজের ভিত ও কাঠামো ধ্বংস করে দিয়ে গড়তে থাকে নিজেদের প্রয়োজনানুসারী এক শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা। এই সুফলা বাংলায় আরম্ভ হয় ধ্বংস ও কৃষক শোষণের এক মহোৎসব। জনসাধারণ-কৃষক-কারিগরদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধও আসে সঙ্গে সঙ্গে। ফকীর-সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে কৃষক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এর সূচনা, মেদিনীপুরের বিদ্রোহে তার বিস্তৃতি। কিন্তু ধ্বংসের প্রক্রিয়া থেমে যায়নি। এই ধ্বংসের পথ ধরেই ১৭৬৯-৭০ সালে বাংলা দেশে আসে সেই মহামন্বন্তর। আর এই মহামন্বন্তরের সমাধিভূমি থেকেই আরও মরিয়া হয়ে প্রকাশ করে বিদ্রোহী বাংলা। কৃষক তন্তুবায়ের বিদ্রোহ (১৭৭০-৮০), রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), যশোর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ (১৭৮৪-৯৬), পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-৮৭), নীলচাষীদের সংগ্রাম (১৮৭৮-১৮০০, ১৮৩০-৪৮, ১৮৫৯-৬১), সিরাজ-গঞ্জের কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩), ইত্যাদি ইত্যাদি। এর মধ্যেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী-জনতার মহা-অভ্যুত্থান। এসব বিদ্রোহ-অভ্যুত্থানের কোনটাতেই মধ্য শ্রেণীটির উভয় অংশেরই কোন সহানুভূতি ছিল না।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বাভাবিক মানবতাবোধ থাকলেও জনসাধারণের বিদ্রোহকে এঁরা ভয় পেতেন। তাঁরা জানতেন, কৃষক-কারিগর শ্রমজীবীর এসব বিদ্রোহ শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেই উৎখাত করে থামবে না, সাম্রাজ্যবাদীরা নিজ প্রয়োজনে যে সহযোগী সমাজের পত্তন করেছে তারও ভিত্তি ধ্বংস করে দেবে। আর নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলতে যায় কে! এর মধ্যে দু'টি নাটক—'নীল দর্পণ' আর 'জমিদার দর্পণ'—দু'টি বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই রচিত। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' রচিত হয় ১৮৬০ সালে, নীলচাষীদের সংগ্রাম যখন তুঙ্গে। আর জমিদারদের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জের কৃষকেরা যখন সংগ্রামরত, তখন ১৮৭৩ সালে মীর মশাররফ হোসেন রচনা করেন 'জমিদার দর্পণ'। 'নীল দর্পণ' যদিও নীলবিদ্রোহের সমর্থনে রচিত নয়, তবুও নীলকরদের কুকীর্তির এক স্পষ্ট দর্পণ ওই নাটক। কিন্তু নীলকরদের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের কোন চিত্র 'নীল দর্পণ'-এ নেই। যা আছে তা হচ্ছে নীলকরদের অত্যাচার-অবিচারের সম্মুখে প্রজাদের অসহায় অবস্থার চিত্র। 'জমিদার দর্পণ'-এর বেলাতেও তা-ই হয়েছে। নাট্যকার জমিদারের ছবি এঁকেছেন, জমিদার চরিত্রের একটা দিকও উদঘাটিত করেছেন। কিন্তু কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে নাটকটি রচিত হয়নি, এমনকি কৃষক বিদ্রোহের পটভূমিকাও তাতে নেই; বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে কৃষকরা তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী শক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করছে, এমনি বক্তব্য তুলে ধরা তো দূরের কথা। অথচ বাস্তবতার রাজ্যে পদচারণা বলেই বঙ্কিম চন্দ্র দু'টি নাটকের নিন্দা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই নিন্দাজ্ঞাপন, মার্কসীয় বিশ্লেষণ অনুসারে তাঁর শ্রেণীচেতনার জন্যই। এবং মধ্য শ্রেণীভুক্ত দীনবন্ধু মিত্র ও জমিদার পরিবারভুক্ত মীর মশাররফ হোসেনও যে সংগ্রামী শক্তির উদ্বোধন না দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে গিয়ে প্রজা ও কৃষককুলের অসহায় অবস্থার চিত্র এঁকেছেন তা-ও ওই শ্রেণীচেতনার জটিলতা থেকেই। তবুও মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু বাংলা মঞ্চনাট্যে দিক-স্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। মাইকেল দেশাত্মবোধের উদ্বোধন করলেন তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী'তে, আর দু'টি প্রহসনে তুলে ধরলেন সমাজের বাস্তবতাকে। দীনবন্ধু 'নীল দর্পণ'-এ জাতীয় জীবনের একটা সংগ্রামী (দুর্বল হলেও) ঐতিহ্যকে মঞ্চে আনলেন। কিন্তু এই ধারা উৎসাহিত হল না, দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করল না। রেনেসাঁর অভিলাষ রিভাইভ্যালিযম বা পুনরুজ্জীবনের বৃত্তে আবর্তিত হয়েই পরিতৃপ্ত হল। পরবর্তী নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটক লিখতে গিয়ে কালের মূল দ্বন্দ্বকে রূপ দেবার চেষ্টা না করে

www.pathagar.com

ইতিহাসের বিকৃতির মাধ্যমে নবজাগ্রত এক 'জাতীয়' ভাবধারা প্রচারে ব্রতী হলেন। ডক্টর গোস্বামীর মতে, "ঐতিহাসিক তথ্যের নানা অসঙ্গতির মধ্যেও যেমন বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য ছিল 'হিন্দুর বাহুবল' তেমনি ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে নাট্যকারেরা যে দেশাত্মবোধক নাটকগুলি লিখেছিলেন তার মধ্যে বহুসংখ্যক নাটকের জাতীয় ভাব প্রকৃতপক্ষে হিন্দু জাতীয়তাবাদ।" (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, পৃঃ ৩০)।

ডক্টর গোস্বামী আরও বলেন, ১৮৭২-এ 'নীল দর্পণ'-এর অভিনয় দিয়ে সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্বোধন হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই সাধারণ রঙ্গালয় ভেসে গেল পৌরাণিক বর্ণাঢ্যতা, রোমান্স ও ধর্মীয় প্লাবনে। এই প্লাবন সৃষ্টি করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'তিনি রঙ্গমঞ্চে সামন্তবাদ ও হিন্দু রিভাইভালিজমের পতাকা উড়িয়ে দিলেন।'

আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, নাট্যকারেরা দেশাত্মবোধক নাটক লিখতেন বটে, তবে এঁদের সবাই দেশাত্মবোধের দ্বারা নিজেরাই খুব উদ্বুদ্ধ ছিলেন কিনা তাতে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ দেখা যায়, একই নাট্যকারের মধ্যে দেশভক্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজভক্তির প্রকাশ ঘটেছে। গিরিশ-চন্দ্রের কথাই ধরা যাক। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল যখন ৬০ বছর হল, তখন এদেশে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গিরিশচন্দ্রও ষ্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ করেন স্ব-রচিত 'হীরক জুবিলী'। 'এই নাটকে স্বভাবতই এমন স্তাবকতা আছে, তা যে কোনও পরাধীন দেশের নাট্যকার লিখতে পারেন—একথা ভাবতেও বিশ্রী লাগে।" (দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, ডক্টর প্রভাতকুমার গোস্বামী, পৃঃ ১৪৪)।

এই-ই যেখানে বিশ্বাসের বলিষ্ঠতা, সেখানে নাট্যকারেরা দর্শক-রুচি নির্মাণ করবেন কি করে? দর্শকদের অভিরুচি অনুসারী নাটকের যোগানদার হওয়া ছাড়া নাট্যকারদের আর উপায় কি! ইতিমধ্যে জমিদার ও মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী-গোষ্ঠীর আত্মসংহতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। এমনি অবস্থায় বঙ্গীয় 'রেনেসাঁ'-ভিত্তিক যে 'জাতীয়তাবাদে'র বীজ অন্কুরিত হল তা ছিল সন্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, সাম্প্রদায়িক এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি আপোষমুখী। তাঁদের আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক সংস্কারের আন্দোলন, বিদেশী শাসকের কাছ থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায়ের আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন নয়। প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচিত হয়েছিল উনিশ শতকব্যাপী জনগণের রক্তক্ষয়ী বিভিন্ন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। কিন্তু জনগণের সংগ্রাম সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তাই ইংরেজ সহযোগীদের হাতেই ন্যস্ত হল তাঁদের সংজ্ঞায়িত সাম্প্রদায়িক

www.pathagar.com

'জাতীয়তাবাদে'র চেতনাভিত্তিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। মার্কসীয় চিন্তাবিদ সুপ্রকাশ রায়ের মতে, "ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে য়ুরোপের ন্যায় সামন্তপ্রথা-বিরোধী বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণী অথবা শ্রমিকশ্রেণী জন্মগ্রহণ করিলে কেবল তাহারাই কৃষক-সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ ও সচেতন নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিতে সক্ষম হইত। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যে বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণী দেখা দিয়াছিল তাহারাও ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থা ও ইংরেজের মুৎসুদ্দিগিরি হইতেই উদ্ভূত। ইহাদের পক্ষে ইংরেজ শাসনকেই ভারতের জাতীয় মুক্তির একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করাই ছিল স্বাভাবিক। ইহারাই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া সেই জাতীয় আন্দোলন কখনও বৈপ্লবিক চরিত্র গ্রহণ করে নাই তাহা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আপসপন্থী রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলন রূপে পরিচালিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যশ্রেণী যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের 'মহাবিদ্রোহ' বা 'ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধে'র বিরোধীতা করিয়াছিল তাহারও মূল ঊনবিংশ শতাব্দীর 'রিনাসান্স' আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন, দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বঙ্গীয় 'রিনাসান্সে'র নায়কবৃন্দ জাতীয়তাবাদের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্তীকালে বিকাশ লাভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে।" (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ১৬৭-১৬৮)।

এঁদের মধ্যেও অল্পবিস্তর পার্থক্য যে ছিল না তা নয়। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে রামমোহনের যতখানি উদারতা ছিল, 'সাহিত্য-সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্রের তা ছিল না। রাজা রামমোহন রায় বঙ্গীয় সমাজের সংস্কারের জন্য পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ভাবধারা আহরণ করে তারই ভিত্তিতে সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নব-হিন্দুবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ভাবধারার বিরুদ্ধাচরণই করেছিলেন। নবহিন্দুবাদ প্রচারের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের যে কাজ আরম্ভ করে যান, তাকেই স্বামী বিবেকানন্দ অনেকটা অগ্রসর করে দেন। বিবেকানন্দ ছিলেন এই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র। তরুণদের প্রতি স্বামীজীর অন্যতম নির্দেশই ছিলঃ "বঙ্কিমের রচনা বারংবার পাঠ কর, আর তাঁহার দেশভক্তি ও সনাতন ধর্মের অনুসরণ কর।" (Swami Vivekananda—Patriot and Prophet, Dr. B. N. Datta, P. 334)।

সেকালে সে-সমাজে এমনি যখন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, তখন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র (জন্মঃ ১৮৪৪—মৃত্যুঃ ১৯১২) তৎকালীন দর্শক-

www.pathagar.com

অভিরুচি অনুসারে প্রচুর নাটক রচনা করে এবং সেগুলো মঞ্চস্থ করে একদিকে সাধারণ রঙ্গালয়কে সমতল পথে দাঁড় করিয়ে দিলেন, অন্যদিকে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে দর্শক-মনে স্থান করে দিতে সাহায্য করলেন। নাটক-প্রহসনাদি মিলে গিরিশচন্দ্রের রচনা-সংখ্যা ৭৫; এবং ৪ খানা নাটক আরম্ভ করেও শেষ করে যেতে পারেননি। গিরিশচন্দ্রই বাংলা মঞ্চ-নাট্য ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধানতম স্থপতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃত-লাল বসু তাঁরও আগে এই কাজে ব্রতী ছিলেন। পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে অবশ্য-স্মরণীয় হচ্ছেন রাজকৃষ্ণ রায়, দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায় এবং আরও আধুনিক কালে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মহেন্দ্রগুপ্ত এবং বিধায়ক ভট্টাচার্য।

গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যকৃতির পর আবার ম্লান হতে আরম্ভ করেছে যখন বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের অঙ্গন, তখই আরম্ভ হল নাট্যবলায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এক নতুন নাট্য সম্প্রদায়ের, যার প্রধান পুরুষ হলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক শিশিরকুমার ১৯২১ সালে অধ্যাপনা ছেড়ে ১০ই ডিসেম্বর রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নাট্য প্রযোজনায় তিনি সূচনা করলেন এক নতুন যুগের। এই পর্যায়ে আবার আরম্ভ হয়েছে সামাজিক নাটকের চর্চা। এই চর্চা নাগরিক হিন্দু উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারকে কেন্দ্র করে। তার প্রায় একচ্ছত্র পেশাদারী অভিযাত্রা চলে বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত। তারপরই হঠাৎ আলোর ঝলকানি নেমে আসে বাংলা মঞ্চ-নাট্যে। সংযোজিত হয় বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। এতদিনকার অবহেলিত জীবন এসে দেখা দেয় রঙমঞ্চে। এক নতুন যুগ, এক নতুন চিন্তাধারা। কিন্তু তার আলোচনা এ-প্রবন্ধে নয়।

———

www.pathagar.com

নয়/বাংলা মঞ্চ-নাট্যে যুগে যুগে পক্ষ-প্রতিপক্ষ

পক্ষ-প্রতিপক্ষ নাটকের নায়ক-প্রতিনায়কের মামুলি অর্থে নয়, বক্তব্য-প্রধান নাটকে যাদের সপক্ষে ঘটনাবলী উপস্থাপিত তারা হলেন পক্ষ আর যাদের বিপক্ষে তা উপস্থাপিত তারা প্রতিপক্ষ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা মঞ্চ-নাট্যে যুগে যুগে পরিবর্তনশীল পক্ষ-প্রতিপক্ষের একটা রূপরেখা তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। লেবেডেফ প্রযোজিত নাট্যানুষ্ঠানের কথা এখানে আনছি না এজন্য যে, ওটা ছিল কৌতুকপ্রদ একটা নাটকের অভিনয়—চিত্তাকর্ষক গান, সং ও ভাঁড়ামির এক সমন্বয়। উঠতি শহর কলকাতার দর্শকদের নিছক মনোরঞ্জনই ছিল তার উদ্দেশ্য। ইংরেজি বা সংস্কৃত নাটকের অনুবাদও বাদ দিয়ে যাচ্ছি, বাদ দিয়ে যাচ্ছি লোক-উপাখ্যান বা রূপকথারও নাট্য-কথা। এবং সেই সঙ্গে পৌরাণিক নাটকের প্রসঙ্গও। লোকগাথা বা রূপকথার আসর তো প্রধানত প্রেম-পরিণয় ও বিরহের আসর। আমাদের লক্ষ্যস্থিত পক্ষ-প্রতিপক্ষের কথা তাতে আসে না, যেমন আসে না ওসব বৃত্তি-সংক্রান্ত সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রেও। পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গে এটুকু মাত্র বলা যায়, পুরাণের দেব-কথা সম্বলিত নাটকে দেব-দেবী তথা আর্যগণ ছিলেন পক্ষে আর দানব-অসুর তথা অনার্যগণ প্রতিপক্ষে। সেমতে আমাদের প্রবন্ধে বিবেচ্য সময় সীমা হচ্ছে মধ্য-উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়টা পর্যন্ত। এই সময়কালকে আবার তিনটি যুগে চিহ্নিত করা যায়ঃ (১) ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত সৌখীন নাট্যানুষ্ঠানের যুগ, (২) ১৮৭২ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত পেশাদারী নাট্যানুষ্ঠানের যুগ, এবং (৩) ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত রাষ্ট্রনৈতিক সংঘর্ষের যুগ।

প্রথম যুগটাকে বাংলা নাটকের প্রস্তুতিকাল বলা যেতে পারে। লোক-উপাখ্যান বলে এ-যুগ থেকে বিদ্যাসুন্দর (১৮৩৫) তো আগেই বাদ পড়েছে, পৌরাণিক বলে তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) এবং রূপকথা বলে যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'ও (১৮৫২) আমাদের আলোচনায়

www.pathagar.com

আসছে না। আর এসব নাটকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়েছে সামাজিক নাটক রচনার পালা। দেখা যায়, এখানকার প্রতিটি নাটকেই সামাজিক কুপ্রথাকে আক্রমণ করা হয়েছে : 'কুলীনকুল সর্বস্ব'-এ কৌলিন্য প্রথাকে, 'নব-নাটক'-এ বহুবিবাহ প্রথাকে এবং আরও কিছু নাটকে সামাজিক কুসংস্কারকে। এসব নাটকের পক্ষ-চিহ্নিত দলে ছিলেন ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদার ও ভূমিস্বত্বভোগী মধ্য শ্রেণী থেকে উদ্ভূত 'রেনেসাঁ'পন্থী বুদ্ধিজীবীরা এবং প্রতিপক্ষে হিন্দু সমাজের গোঁড়া ও রক্ষণশীল সমাজপতিরা। অতঃপর অভিজাতদের সৌখীন নাট্যমঞ্চে এসেছে ঐতিহাসিক নাটক। ১৮৫৯ সালে পৌরাণিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনার পর 'রিজিয়া' নাটক রচনা করতে চেয়েছিলেন মাইকেল। বেলগাছিয়া থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ এ-কাজ থেকে বিরত করলেন তাঁকে। ১৮৬০ সালে মাইকেল পর-পর রচনা করলেন দু'টি প্রহসন। তাও অভিনীত হল না বেলগাছিয়া থিয়েটারে। প্রহসন দু'টির পক্ষীয় দলে ছিলেন বলতে হয় মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন প্রকৃত রেনেসাঁবাদী মাইকেলের মত প্রগতিবাদীরা আর প্রতিপক্ষে — 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ-কর্তারা এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা ?'-এ অতি-আধুনিক বিপথগামীরা। এমনি পরিবেশে ১৮৬১ সালে মাইকেল টডের 'রাজস্থান' থেকে নাট্যিক উপাদান নিয়ে রচনা করলেন 'কৃষ্ণকুমারী', বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম সার্থক দেশাত্মবোধক ট্র্যাজেডি। তা-ও অভিনীত হল না বেলগাছিয়া থিয়েটারে। ১৮৬০ সালে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'ও কিন্তু বেলগাছিয়ার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। 'নীল দর্পণ'-এ পক্ষে ছিলেন বাংলার নিগৃহীত কৃষক সমাজ এবং প্রতিপক্ষে ইংরেজ শাসকদেরই একটা অংশ নীলকরেরা। আর 'কৃষ্ণকুমারী'তে পক্ষেও রাজপুত, প্রতিপক্ষেও রাজপুত। কুলমান রক্ষার জন্য, পিতৃরাজ্যকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য একটি নিষ্পাপ রাজপুত তরুণী স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিল—এই হচ্ছে 'কৃষ্ণকুমারী'র মূল বক্তব্য। সম্পূর্ণ মানবিক এবং সাহিত্য-প্রেরণাজাত রচনা। অথচ 'রেনেসাঁ'পন্থী রাজাদের থিয়েটারে তা অভিনীত হল না। অভিনীত হয়েছিল নাটক প্রকাশের ৬ বছর পরে প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির শোভাবাজার নাট্যশালায়।

এসব ঘটনাবলী থেকে এ-সত্যই প্রমাণিত হয় যে, এদেশীয় উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা জ্ঞানত ছিলেন রেনেসাঁবাদী, বলা যায় রেনেসাঁ-অভিলাষী; কিন্তু কার্যত বিদেশী শাসকের অনুগত সহযোগী। প্রথমদিকে বহুদিন এই আনুগত্য ত্যাগ করে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার সাহসও ছিল না এঁদের, নিজেদের শ্রেণী-স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। তাই চরিত্রে স্ব-বিরোধিতা। একদিকে তাঁরা সমাজ-সংস্কারের ব্রতে উদ্যমশীল 'রেনেসাঁ'পন্থী, অন্যদিকে আঠার শ' সাতান্ন-আটান্নর মহাঅভ্যুত্থান ও নীল-

www.pathagar.com

বিদ্রোহসহ কৃষক-কারিগর-জনসাধারণের সকল প্রতিরোধ সংগ্রামের বিরুদ্ধে শাসক-শোষকদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ। ইউরোপীয় রেনেসাঁর বলিষ্ঠতা তাঁদের চরিত্রে ছিল না বলেই তাঁরা 'নীল দর্পণ' ও 'জমিদার দর্পণ'-এর পক্ষীয় কৃষকদের সমর্থন জানাতে পারেননি। সম্প্রদায়গত চিন্তার সংকীর্ণতায় মনটি চাপা পড়েছিল বলেই মাইকেলকে তাঁরা বিরত রাখেন 'রিজিয়া' রচনা থেকে। 'নীল দর্পণ' মঞ্চস্থ করা দূরে থাক, 'কৃষ্ণকুমারী'কেও তাঁদের থিয়েটারে বরণ করে নেওয়ার সার্থকতা খুঁজে পাননি! মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'জমিদার দর্পণ' এর তো কথাই ওঠে না।

১৮৭২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়, পেশাদারী থিয়েটার। আরম্ভ হল দ্বিতীয় যুগ। এই যুগের আরম্ভে ১৮৭৩ সালে বাংলা নাটকের দুই কৃতী পথিকৃৎ মাইকেল ও দীনবন্ধু মারা গেলেন। অবিশ্যি তাঁদের নাটক, বিশেষ করে দীনবন্ধুর সামাজিক নাটক নিয়েই আরম্ভ হল পেশাদারী থিয়েটারের জয় যাত্রা। দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-তে পক্ষীয় দলে ছিলেন সেই সমাজ সংস্কারক 'রেনেসাঁ'পন্থীরা এবং প্রতিপক্ষে সমাজের রক্ষণশীলরা। কিছুদিন পর মঞ্চস্থ করার জন্য প্রয়োজন দেখা দিল নতুন নাটকের, নতুন নাট্যকারের। এগিয়ে এলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অমৃতলাল বসু প্রমুখ নতুন নাট্যকারগণ। নিজ নিজ মতামত ও মানসের প্রতিফলনই ঘটল তাঁদের নাটকে। ইতিমধ্যে উদীয়মান বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে, শাসকের দেওয়া সুযোগ-সুবিধার ভাগে কমতি পড়তে আরম্ভ করেছে, এবং তার ফলে 'প্রতিভা' অবহেলিত হওয়ায় 'রেনেসাঁ'-অভিলাষীদের মধ্যে ইংরেজ শাসনের প্রতি মোহমুক্তি ঘটতে আরম্ভ করেছে। তাঁদের অনুভবে নাড়া দিচ্ছে তখন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের লুণ্ঠন-বঞ্চনা-অত্যাচার-অবিচারের কথা। ফলে, খেটে-খাওয়া মানুষের বিপর্যস্ত সংগ্রামের পথে নয়, নিজেদের ধারণা-উদ্ভূত এক নতুন পথে 'জাতীয় আন্দোলন' সংগঠনের ভাবনা তাঁদের মনে এসেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনে প্রশ্ন: "...ভারতবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কিনা? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান তাহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিনা?" (ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, প্রবন্ধ মঞ্জরী, ১৯০৫)। ক্রমে এই প্রশ্নের উত্তরও স্পষ্ট হয়ে গেল বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত ও বক্তব্যে। স্পষ্ট হল যে, পুনরুজ্জীবিত নব্য হিন্দু-জাতীয়তাবাদই ভারতবর্ষীয় জাতীয়তাবাদ। ভারতবর্ষের একটি সম্প্রদায়ই চিহ্নিত হল তার জাতি হিসাবে। অতঃপর বিবেচ্য বিষয় হল, এই 'জাতীয় আন্দোলন' কোন পথে কি কৌশলে অগ্রসর হবে। আন্দোলনটা আসলে তো করতে হচ্ছে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে। সেখানেই তো ভয়!

www.pathagar.com

অবশেষে কৌশলের দিশা পাওয়া গেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পলিটিক্যাল এজেন্ট লেফটেন্যান্ট-কর্ণেল জেমস টড রচিত Annals and Antiquities of Rajasthan গ্রন্থ থেকে। কৌশলটা হল: টডের গ্রন্থ থেকে কাহিনী নিয়ে সেটাকে এমনভাবে সাজিয়ে নিতে হবে যাতে রাজপুতদের নামে হিন্দুদের দেশাত্মবোধ যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও যেন বুঝতে পারেন যে, মুঘলদের নাম করে প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজ শাসনকেই আক্রমণ করা হচ্ছে। এই কৌশলই গ্রহণ করলেন নাট্যকারেরা। আরম্ভ হল ইতিহাসের নামে বিকৃত উদ্দেশ্যমূলক 'ঐতিহাসিক' নাটক রচনার পালা। শুধু মুঘল-রাজপুত নয়, মুঘল-মারাঠা, মুঘল-শিখ—সবার সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক তথ্য-বিকৃতির মাধ্যমে প্রতিপক্ষীয় মুঘল তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পক্ষীয় রাজপুত-মারাঠা-শিখ তথা হিন্দুদের সংগ্রাম কাহিনী নিয়ে নাটক রচনার উদ্দীপনা। ওদিকে রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে হিন্দু জমিদার ও অভিজাতদের সংগঠন British India Association-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে হিন্দু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ১৮৮৬ সালে গড়ে তুলেছেন Indian Association, যার মাধ্যমে 'জাতীয় আন্দোলনে'র পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। আবার Mahomedan Association-ও গঠিত হয়েছে কাছাকাছি সময়েই। এদিকে নাট্যক্ষেত্রে জারি করা হয়েছে ১৮৭৬ সালের নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন। এমনি পরিস্থিতিতে 'ঐতিহাসিক' নাটকের জোয়ার এল বাংলা নাট্যমঞ্চে। পাশাপাশি পৌরাণিক নাটকও রচিত হতে থাকল বেশি করে।

মাইকেল তো মধুকবি, দুরন্ত দুঃসাহসী, কিন্তু মধুভরা যাঁর বিশাল হৃদয়। কল্পনায় ছিল না চিকন বুদ্ধির মারপ্যাঁচ, ছিল আল্‌প্‌স্‌ পর্বতমালার উঁকি দেওয়া সুউচ্চ চূড়াবলীর 'শীর্ষে ওঠার অশান্ত অভিলাষ! 'রিজিয়া' রচনা হল না যখন, তখন উপদিষ্ট হয়ে টডের 'রাজস্থান' থেকে নাট্যিক উপাদান নিয়ে রচনা করলেন 'কৃষ্ণকুমারী'। বিকৃতির পথ এড়িয়ে দেশাত্মবোধ যতটুকু আসবার এল। কিন্তু মাইকেল প্রদর্শিত পথে অন্য নাট্যকারেরা বিচরণ করলেন সংকীর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে। এর ফল ভারতীয় জাতীয় জীবনে সুখকর হয়নি—অতিরিক্ত হিন্দু মানসিকতাকে অবলম্বন করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প উদগীরিত হয়েছে। "পাঠক যদি একটু অবহিত হইয়া তখনকার ঐতিহাসিক নাটক পাঠ করেন তাহা হইলে দেখিবেন, কাব্যের অমৃত ধারা অপেক্ষা জাতি-বৈরিতার বিষ তার সর্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে।" (রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃঃ ৯৩)।

উদাহরণস্বরূপ প্রতাপাদিত্যের কথাই নেওয়া যাক। ডক্টর রমেশচন্দ্র

www.pathagar.com

মুজমদারের কথায়, "প্রতাপাদিত্য অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোনও যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙ্গালী জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল সুবাদারকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যাঁহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—ঈশা খাঁ, উসমান খাঁ প্রভৃতি—তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান।" (বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৩ সন, পৃঃ ২১৭)। অথচ নাটকের পর নাটকে মুঘলদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমমূলক সংগ্রামে প্রতাপাদিত্য জাতীয় বীর! এমনি আরও অনেক অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় ওই যুগের প্রায় সকল 'ঐতিহাসিক' নাটক থেকে। পক্ষে নব্য হিন্দু-জাতীয়তাবাদের বীরবৃন্দ, প্রতিপক্ষে ইংরেজের প্রক্সি-রত মুসলমান শাসক।

এভাবে ইতিহাস বিকৃত করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে যাঁরা চাপালেন, মুহূর্তের জন্যও তাঁরা ভাবতে চাইলেন না যে, বুধোরাও একদিন এ-ব্যাপারে সরব হতে পারেন। প্রকৃত প্রস্তাবে নাটকের অঙ্গনে আনাগোনা না করলেও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে বুধোরা কিন্তু ততদিনে সরব হয়েই গেছেন। এক সম্প্রদায় যখন 'জাতি' সেজে নিজেদের মঙ্গলের কথা তো বলছেনই সঙ্গে সঙ্গে বুধোদেরও সমানে 'বকাঝকা' করছেন, তখন বুধোদের সম্প্রদায়ও নিজেদের কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। আঠার শ' সাতান্ন-আটান্নর অভ্যুত্থানের ফলাফল দেখে মুসলমানেরা অসহযোগ ছেড়ে শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতার পথে এসে গেছেন। আর শাসক কর্তৃক দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে স্বীকৃতও হয়ে গেছেন। ভাবে-গতিকে বুঝা গেল, প্রথম পক্ষ তাতে খুব খুশি হননি। তবে বিশেষ কারণে কর্তৃপক্ষ যথেষ্টই খুশি হলেন। আরম্ভ হল বিশ শতক। দুই পক্ষের ভেদাভেদ-বোধ সোচ্চার হয়ে উঠল রাষ্ট্রনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, এবং তারই সঙ্গে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও।

১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ইংরেজ সরকার থেকে ঘোষণা করা হল বঙ্গ-ভঙ্গ পরিকল্পনার কথা এবং ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর তা কার্যকরীও করা হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম পক্ষের নেতৃত্বে আরম্ভ হল 'বঙ্গচ্ছেদ' রদ করার আন্দোলন। দেশাত্মবোধের উন্মাদনায় সংযোজিত হল হিন্দু-মুসলিমের মিলন-কথা। এই তৃতীয় যুগে বাংলা নাট্যকৃতিতে সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে বইতে লাগল সম্প্রীতির স্রোত। ইতিহাসের স্বীকৃত তথ্যের বালাই আগেও ছিল না, এবারেও থাকল না। সঙ্গত হোক আর অসঙ্গত হোক, হিন্দু-মুসলমান যে এক ও অভিন্ন—একথা উচ্চারিত হতে থাকল সকল 'ঐতিহাসিক' নাটকেই। তখন থেকে নাটকে পক্ষীয়রা হলেন 'একই মায়ের সন্তান হিন্দু-মুসলমান' এবং প্রতিপক্ষীয়রা ইংরেজ শাসক। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষ যেখানে আগেই যথেষ্ট ছড়ানো হয়ে গেছে এবং তাকেই কাজে লাগাতে

www.pathagar.com

ইংরেজ সরকার খুবই ব্যস্ত, সেখানে মিলনের ঐক্যতান কি আর কার্যকরী হয়? অভিনয় মঞ্চে একের পর এক হাজির হলেন নবাব সিরাজ, নবাব মীর কাসেম এবং আরও অনেকেই। প্রথম পক্ষের 'জাতীয়তা' তখন একেবারেই অসাম্প্রদায়িক, বিশেষণবিহীন। গিরিশচন্দ্রের নবাব সিরাজ তো জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকের মতই আহ্বান জানালেন: "ওহে হিন্দু-মুসলমান/এস করি পরস্পর মার্জনা এখন/... বঙ্গের সন্তান— হিন্দু-মুসলমান/ বাঙ্গালার সাধিব কল্যাণ।"...ইত্যাদি। (গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত 'সিরাজউদ্দৌলা,' প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য)। কিন্তু এত সবের মধ্যেও একটা মজার ব্যাপার লক্ষণীয়। নাটকে জাতীয় বীর ও স্বাদেশিকতার মূর্ত বিগ্রহ নবাব সিরাজের হত্যাকাণ্ডের পর নাটক শেষ হচ্ছে যখন, তখন চারণগণের কণ্ঠে কোন দেশাত্মবোধক গান না দিয়ে দেওয়া হয়েছে কোম্পানী শাসনের গুণগান-সম্বলিত আনন্দ-সঙ্গীত: "উড়েছে কোম্পানীর নিশান/ বাহাদুর কলির ঠাকুর, ভুবন কাঁপায় যার কামান। - - - এরা রাজার রাজা পালবে প্রজা, ছোট-বড় এক সমান।"

ওদিকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের চিত্র খুব দ্রুত বদলাতে আরম্ভ করেছে। বঙ্গচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে বিপ্লবী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে। প্রথম পক্ষীয় আন্দোলনের মুখে বঙ্গচ্ছেদ রদ ঘোষিত হয়েছে ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বের। ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে, এবার ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম লীগ। দুই পক্ষের দুই রাজনৈতিক মঞ্চ। এরই মধ্যে আবার বোমা-পিস্তলের রাজনীতিও প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। তদুপরি ১৯১৪ সালে আরম্ভ হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রাজনৈতিক মঞ্চে দুই পক্ষের আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা সত্বেও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা বেড়েই চলল। রাজনৈতিক তিক্ততা যতই বাড়ছে, নাটকের মঞ্চে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আবেদন ততই উচ্চগ্রামে চড়ছে। নাটকে তখন পাল্টাপাল্টিই পক্ষীয় দলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রবক্তাগণ আর প্রতিপক্ষে ইংরেজ শাসক। বিশ্ব-প্রেক্ষাপটের চলচ্চিত্রে বিরতি ঘোষিত হল ১৯১৮ সালে, শেষ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এদেশীয় রাষ্ট্রীয় মঞ্চে তখনও চরম উত্তেজনা। ইংরেজ বলেছিল, এদেশবাসীকে স্বরাজ দেবে। দেয় না দেখে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আরও তীব্র হয়ে দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে দমননীতি হল আরও কঠোর। ১৯২১ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে আরম্ভ হল আইন অমান্য আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ। এমনি পরিবেশে নাটকে পক্ষ-প্রতিপক্ষ আগের মতই। তারপর ১৯২২ সালের প্রথম দিকে আইন অমান্য আন্দোলন সংঘর্ষের পথ ধরছে দেখে গান্ধীজি চিন্তিত হলেন। তিনি সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখলেন, আইন অমান্য আন্দোলনও বন্ধ করে দিলেন।

www.pathagar.com

শান্ত হয়ে এল রাজনৈতিক অঙ্গন। নাট্যাঙ্গনের উৎসাহেও ভাটার টান পড়ল। এই ভাটার মুখে 'ঐতিহাসিক' নাটকের স্থান অনেকাংশে আবার দখল করল সামাজিক নাটক, প্রধানত নিরীহ প্রেমের কাহিনী নিয়ে। কাজেই পক্ষ-প্রতিপক্ষের কথাটাও অনেকটা আড়ালে চলে গেল। কেমন যেন একটা অবসাদ! আর এই অবসাদের সময়টায় নাটকের উৎসাহ প্রকাশের উপযুক্ত পথ খুঁজতে খুঁজতে এক সময় ঢুকে গেল হিন্দু উচ্চবিত্তদের ড্রইং রুমে। প্রেম-বিরহ কেন্দ্রিক নানা জটিলতার ঔৎসুক্যে দর্শকদের সময় কাটছে ঢিমে-তালে। এমনি করে কেটে গেল প্রায় দেড় যুগের মত সময়। তারপর একদিন ১৯৩৯ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর আবার আরম্ভ হয়ে গেল বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

বিশ্বযুদ্ধ যখন চরম অবস্থায় উপনীত, তখন ১৯৪৩ সালের দিকটায় বাংলা দেশের, বিশেষ করে কলকাতাকে বুকে নিয়ে পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা খুবই সংকটজনক। হিটলার আর মুসোলিনীর মিত্র জাপানের আক্রমণে হটে আসছে বৃটিশের পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনী। বোমা পড়ছে রেঙ্গুনে, প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে লোকজন। জাপানী বিমানের পাল্লার মধ্যে এসে গেছে কলকাতা। বোমা পড়তে পারে যে কোন সময়ে। সেই ভয়েই খালি হয়ে যাচ্ছে কলকাতা। পালাচ্ছে লোকজন; যে যেখানে পারে, মফস্বল শহরে, গ্রামে-গঞ্জে। পোঁটলা-পুঁটলি, কাচ্চা-বাচ্চা, বৌ-বেটি নিয়ে হাজারে-বিজারে মানুষ চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। যানবাহন পাওয়া না গেলে পায়ে হেঁটে। বোমা বুঝি পড়ে পড়ে! একদিন বোমা পড়েই গেল কলকাতায়। দিনে রাতে ঝাঁক ঝাঁক জাপানী বোমারু বিমান কলকাতাকে হতচকিত করে গেল। চলমান জনস্রোত দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হল। প্রায় খালি হয়ে গেল কলকাতা।

কিন্তু যাবেই বা কোথায়! দুর্ভিক্ষের দানব যে বাংলার সর্বত্র মুখ ব্যাদান করে অপেক্ষা করছে! বাংলা দেশে সৃষ্টি করা হল এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। মৃত্যু-যজ্ঞ আরম্ভ হল বাংলা দেশে। হাহাকার উঠল আকাশে-বাতাসেঃ খাদ্য নেই, জীবন ধারণের কোনও উপায় নেই! যজ্ঞ-পিশাচ মুনাফাখোর মজুত-দারেরা খাদ্য-বস্ত্র সব কিছু মজুত করে ফেলেছে। প্রকাশ্য বাজারে কিছু নেই। সাদা বাজারকে গ্রাস করেছে পিশাচ-সৃষ্ট কালো বাজার। ডুকরে কেঁদে উঠল বাংলার অসহায় মানুষ। শুরু হয়ে গেছে মহামন্বন্তর। গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো চলল শহরে, নগরে, স্বপ্নের কলকাতায়। জোয়ান মানুষের কঙ্কালসার কাঠামোগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ল নগরীর ফুটপাতে। পথে পথে মৃতদেহের স্তূপ, দুয়ারে দুয়ারে আর্ত প্রার্থনাঃ ফ্যান দাও, ফ্যান!

www.pathagar.com

ইউরোপীয় রেনেসাঁর উত্তরসূরী শাসকদের সৃষ্ট মহামন্বন্তরে মরে গেল বাংলার পঞ্চাশ লাখ মানুষ !

কিন্তু সবাই তো আর কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে পারেনি। আটকে পড়া অনেকেরই যাবার কোন উপায় ছিল না। আর ইচ্ছে করেই যায়নি মওকালোভীরা। কলকাতার কালো রাতের অন্ধকারে বিচিত্র বীভৎস কত কাহিনীর বিচরণ! মহামন্বন্তরের লেহন করা প্রান্তরে-পথে লক্ষ মানুষের কঙ্কাল, রাতের অন্ধকারে পেটের জ্বালা নিবারণ করতে কন্যা-কুলবধূদের দেহ বিক্রয়, নিষ্প্রদীপ রাতের চোরাগলিতে লালসা আর লোভের সওদা, মজুতদার-মহাজন-দালালদের অফিস-কুঠরীতে মনুষ্যত্বের বেচাকেনা ! বঙ্গবাসীর অন্তরে অন্তরে বিক্ষোভ, গ্লানি আর অপমানের জ্বালা।

দেশের এমনি পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন প্রচলিত ধারার নাটক দর্শকদের কাছে আর আবেদনশীল থাকতে পারার কথা নয়। তাই প্রয়োজন দেখা দিল নব-নাট্যের। প্রয়োজনটা ধরা পড়ল বুদ্ধিজীবী রাজনৈতিক সং-চেতনাসম্পন্ন কিছু মানুষের মনে। তাঁরা ভাবলেন, নাটক তো হচ্ছে সমাজ-বিপ্লবের অন্যতম এক হাতিয়ার—যা দেশকে তার রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো বদলাতে সাহায্য করবে। তাঁদের বিশ্বাস জন্মাল, থিয়েটারকে হতে হবে জীবন-ঘনিষ্ঠ।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের কেউ কিন্তু এ প্রয়োজনটা মেটাতে এগিয়ে আসেননি। এগিয়ে এসেছিলেন নব-ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কিছুসংখ্যক অপেশাদারী তরুণ। ১৯৪২ সালে সংগঠিত 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'র একটি শাখা—নাম তার 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'। এই সংঘ থেকে একটা অনুষ্ঠানে অভিনীত হল একটি নাটিকা, বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'জবানবন্দী'। এ নাটিকার ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছিলেনঃ "সেও এক সোনা ধানের দুঃস্বপ্ন—মাঠের রাজা পরান মণ্ডল [জবানবন্দীর নায়ক], সে স্বপ্ন দেখতে দেখতে কোলকাতার ফুটপাতে হুমড়ি খেয়ে মরেছিল।" তারপরই বিজন ভট্টাচার্য লিখলেন 'নবান্ন'—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কথায়, "বাংলার বিগত দুর্যোগ নবান্নের পটভূমিকা।" (জনযুদ্ধ, ৮ই নভেম্বর, ১৯৪৪)।

'নবান্ন' শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৪ সালের ২৪শে অক্টোবর। সাতদিন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়ের পর লোকের মুখে মুখে ফিরতে থাকে একটি নাম—'নবান্ন' 'নবান্ন'। বাংলা মঞ্চ-নাট্যের জগতে আবার সূচিত হল জীবন-ঘনিষ্ঠ নব-নাট্যের ধারা। এখানে আমাদের স্মরণ করতে হবে সেই দীনবন্ধু

www.pathagar.com

মিত্রকে—যাঁর রচিত 'নীল দর্পণ' ছিল এই ধারার প্রথম জীবন-ঘনিষ্ঠ নাটক। মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ'ও ছিল জীবন-ঘনিষ্ঠ নাটক। কিন্তু তা কলকাতায় অভিনীত হয়নি। এবার এই মহামন্বন্তরের পটভূমিতে নূরুল মোমেন লিখলেন এক-চরিত্রবিশিষ্ট এক অভিনব চমৎকার নাটক—'নেমেসিস'। 'শনিবারের চিঠি'তে এই জীবন-ঘনিষ্ঠ নাটকটি মুদ্রিত হওয়ার পর খুবই প্রশংসিত হয়েছিল, 'নাটকটি কলকাতার সাহিত্যিক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল'। কিন্তু তা-ও অভিনীত হয়নি।

---

www.pathagar.com

দশ/আমাদের নাট্য-অভিজ্ঞতা ও নাট্য-সংস্কার

'আমাদের' বলতে এই জনপদের অধিবাসীদের বোঝাচ্ছি, যে জনপদের তৎকালীন ভৌগোলিক নাম ছিল পূর্ববঙ্গ, পরে পূর্ব পাকিস্তান এবং আজ বাংলাদেশ। আর যে সময়কার নাট্য-অভিজ্ঞতা ও নাট্য-সংস্কারের কথা বলতে যাচ্ছি তা হচ্ছে উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের পূর্ব পর্যন্ত সময়টা। ওই সময়ে আমরা কতটুকু এবং কি ধরনের নাট্য-অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলাম এবং তখন এই জনপদবাসীর নাট্য-সংস্কারই বা কি ছিল, তার একটা ধারণা দেওয়াই এ-প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। অবিশ্যি এ-পর্যন্ত কিছু না-বলা কথাও এ প্রবন্ধে এসে যাবে এবং প্রসঙ্গত বলা কিছু কথারও কিছুটা পুনরুক্তি ঘটবে।

আগেকার অন্যান্য প্রবন্ধে বাংলা মঞ্চ-নাট্যের গতিপথ ও প্রকৃতি পরিচয় নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে লেবেডেফের দৃষ্টান্তে পাশ্চাত্য ধরনের মঞ্চ-নাট্যের প্রতি এদেশীয় তৎকালীন নাট্যামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণের কথা, তারপর পাশ্চাত্য নাটকের অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে বাংলা মঞ্চ-নাট্যের পথচলার শুভ সূচনার কথা। নতুন দিনের সূর্য যখন এদেশের আকাশে প্রাথমিক প্রখরতায় উজ্জ্বল, এ দেশীয় নব্য-শিক্ষিতদের দৃষ্টি-দিগন্তে তখন নানা পথের হাতছানি। স্বাভাবিকভাবেই সূচনা-পথ ছিল বিবিধ কারণে বন্ধুর ও অন্বেষণমূলক। পথের সঠিকত্ব নির্ণয় ছিল ভাবনাসংকুল ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পথ-সূচনার সেই বন্ধুরতায় নাট্যকৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র। জাতীয় পরিচয়ের অন্বেষা তখন খুবই সক্রিয়। নতুন দিনে গড়ে-ওঠা নগরে-বন্দরে, অফিসে-আদালতে নব্য-শিক্ষিত হিন্দু ভাগ্যবানেরা, আর বনে-জঙ্গলে মাঠে-ময়দানে বেশীর ভাগ মুসলমান ভাগ্যহতরা। ভাগ্যবানদের চিন্তায়ই তখন জাতীয় পরিচয়ের অন্বেষা। সে-পরিচয়ও চিহ্নিত যখন, ঘটনাচক্রে তখনই বাংলা মঞ্চ-নাট্য সৌখিনতার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে সাধারণ

www.pathagar.com

দর্শকের মেলে এসে আসর জমাল। প্রতিষ্ঠিত হল সবার জন্য উন্মুক্ত পেশাদার থিয়েটার। তারপর তার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা।

সৌখিন থিয়েটারের সুবিধা-অসুবিধার মত পেশাদার থিয়েটারেরও সুবিধা-অসুবিধা ছিল। সব দেশেই তা থাকে। তবে এদেশে তা ভিন্ন প্রকৃতির। সৌখিন থিয়েটারের কর্মকর্তারা নিজেদের অর্থে নাট্যানুষ্ঠান করতেন। দর্শকবৃন্দ থাকতেন তাঁদেরই পছন্দমাফিক নিমন্ত্রিত গুণী-মানী ব্যক্তিবর্গ। অপেশাদার থিয়েটারে কোন্ নাটক অভিনীত হবে, কি হবে তার বক্তব্য এসব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী কর্তাব্যক্তিরাই। প্রগতিপন্থী বা অন্যপন্থী অথবা নিছক জাঁক-জমকপূর্ণ বিনোদনমূলক যে কোন নাটক তাঁরা অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করতে পারতেন বা নাট্যকারকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারতেন। এবং তদনুযায়ী ক্রমে ক্রমে নির্মাণ করতে পারতেন দর্শকদের নাট্য-ধারণা। এসব ছিল সুবিধার দিক। অসুবিধা ছিল, দেশের সাধারণ দর্শকের তাতে প্রবেশের সুযোগ ছিল না। ফলে নাটক হয়ে দাঁড়াত মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের উপভোগ্য, জনসাধারণের নয়। আর পেশাদার থিয়েটারের সুবিধা ছিল, নাটক উপভোগ করার সুযোগ থাকত সবারই; টিকেটের বিনিময়ে নাটক উপভোগ করতে পারতেন যে-কেউ। কিন্তু অসুবিধা ছিল, নাট্যানুষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহ এবং থিয়েটারের ফাণ্ডে কিছু সঞ্চয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরি নির্ভর করত দর্শক সংখ্যার উপর অর্থাৎ দর্শকদের পছন্দ-অপছন্দের উপর। তাই সাধারণ দর্শকদের রুচি ও মন-মানুষের সঙ্গে সংগতি রেখে নাট্যকারকে নাটক লিখতে হত। জনপ্রিয় হবে না এমন নাটক মঞ্চায়নের ঝুঁকি পেশাদার থিয়েটার গ্রহণ করতে পারত না; প্রতাপ চাঁদ জহুরীদের মত ব্যবসায়ীরা তো নয়ই। আর বৃহত্তর ভাবে দর্শক-রুচি ও মন-মানস প্রভাবিত হত দেশে বিরাজমান রাষ্ট্রনৈতিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি দ্বারা।

এখানে উল্লেখ্য, সৌখিন থিয়েটারের আমলে উচ্চবিত্ত কর্তৃপক্ষের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য মহাকবি মাইকেল নিজের নাট্য-কল্পনাকে রূপায়িত করতে পারলেন না। আর দীনবন্ধুকে তো তাঁরা পাত্তাই দিলেন না। আরম্ভ হল পেশাদার থিয়েটারের যুগ। দীনবন্ধুর নাটক নিয়েই তার যাত্রা শুরু। এবং তা হল ফলপ্রসূ কল্যাণময়। মাইকেল-দীনবন্ধুর তিরোধানের পর কিছুদিন থিয়েটার চলল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে। তাও যখন শেষ হল, তখন মুমূর্ষু রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নব-প্রাণে

www.pathagar.com

সঞ্জীবিত হয়ে উঠল পেশাদার থিয়েটার। বাংলা নাটকের গতিপথকে তিনি পরিণত করলেন সুপ্রশস্ত সুগম জনপথে। নাট্যকাররূপে, অভিনেতারূপে, প্রয়োগ-কর্তারূপে তিনি হলেন বাংলা মঞ্চ-নাট্যের ভগীরথ-সাধক। যে গতিবেগ তিনি সৃষ্টি করলেন বাংলা নাট্য-মঞ্চে, তাঁর তিরোধানে সেই গতিবেগ রক্ষা করে চললেন অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি নাট্যকারগণ। সামগ্রিকভাবে বাংলা নাটকের রূপ-প্রকৃতি ততদিনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে; সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি তখন বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদে পুরোপুরি প্রভাবিত, নব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনায় চঞ্চল। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান বৈরিতাও সুস্পষ্ট। বিশ শতকে এসে নাটকে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা জোরেশোরে উচ্চারিত হলেও ভেদ-রেখা আর নিশ্চিহ্ন হল না। রূপের দিক দিয়ে বাংলা নাটক পাশ্চাত্য মঞ্চের বাহ্য রীতি গ্রহণ করে প্রকৃতিতে তা হয়ে দাঁড়াল হিন্দু সম্প্রদায়ের নাটক। দর্শক মানসের প্রতি অনুগত থেকে পেশাদার থিয়েটারের নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল নাট্যকারই বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তার ধারণাকেই নাট্য-বক্তব্যের ভিত্তিমূলে স্থাপন করলেন। অবিশ্যি দুয়েকজন যে এর অন্যথা করতে চেষ্টা করেননি তা নয়। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

তারপর ক্রমে ক্রমে মঞ্চে এল হিন্দু উচ্চবিত্তের সামাজিক ড্রইং রুম নাটকের একঘেঁয়েমি। এবং সেই একঘেঁয়েমিকে একদিন সজোরে আঘাত হানল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তারই সঙ্গে শাসক সৃষ্ট মহামন্বন্তর। আর তার মধ্য থেকেই জন্ম নিল নব-নাট্যধারা। 'নীল দর্পণে'র প্রায় ৮০ বছর পর মঞ্চে এল 'নবান্ন', যার কথা পূর্ব প্রবন্ধেই বলা হয়েছে।

বলা হয়নি শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা। সকলের সঙ্গে তাঁর কথা বলা হয়নি, কারণ রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাট্য-সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র নাট্য-ব্যক্তিত্ব। এই স্বতন্ত্র নাট্য-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা আমার সাধ্যাতীত বলেই অন্য পণ্ডিতজনের কিছু বক্তব্য এ-প্রবন্ধে তুলে ধরে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ শেষ করব। ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ অন্য নাট্যকারদের থেকে আলাদা এজন্য যে অন্যান্য নাট্যকার সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য নাটক রচনাকালে "জনসাধারণের রুচি ও শিক্ষা সংস্কারাদির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেদিকে বড় লক্ষ্য করেন নাই। ...সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁহার নাটক বেশী অভিনীত হয় নাই, কারণ, তাঁহার অধিকাংশ নাটকই closet-drama বা বৈঠকী-নাটক জাতীয়। কাব্য ও মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণাদির দিক দিয়া দেখিলে সেগুলি যে অপূর্ব হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা

www.pathagar.com

যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই গ্যটের নাটকের ন্যায় 'caviare to the general'—তাহাদের স্বাদ গ্রহণ ও উপভোগ করা অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত সাধারণের পক্ষে একরূপ অসাধ্য বলিলেই হয়। টমসন সাহেব ঠিকই বলিয়াছেন, 'His dramatic work is the vehicle of ideas rather than expression of action.' অর্থাৎ নাটকীয় ক্রিয়া-প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নাটকগুলি লেখা হয় নাই, পরন্তু সেগুলি তাঁহার ভাবের বাহন স্বরূপেই রচিত হইয়াছে।" (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃঃ ১৮৬-১৮৭)। অথচ বিশ্ব-নাট্যের অন্যতম নাট্যকার Suigi Pirandello বলেন, "Drama is action, sir, action, not confounded Philosophy."

উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাট্যগুলির কথা বলছি। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের প্রতীক হচ্ছে 'অন্ধকার ঘর', এবং তার বক্তব্য ঃ রূপ-বুদ্ধি-ঐশ্বর্য এসবের অহমিকা দূর হলেই দেখা দেয় পরম সুন্দর। তাঁর 'মুক্তধারা'র প্রতীক 'যান্ত্রিক বাঁধ ও শিবমন্দিরের ত্রিশূলচূড়া', এবং বক্তব্য ঃ যন্ত্রদানবের উপর আত্মা ও কল্যাণ শক্তির জয়। 'রক্ত-করবী'র প্রতীক 'জালের বেষ্টনী ও কৃষ্ণকরবীর গুচ্ছ', এবং বক্তব্য ঃ যন্ত্রের স্রষ্টা মানুষ ক্রমে পরিণত হয়েছে যন্ত্রদাসে, তাই সে হারিয়েছে জীবনের সোনারঙ আনন্দকে। আর 'ডাকঘর' নাটকের প্রতীক 'অমলের ঘর ও বাতায়ন', এবং বক্তব্য হচ্ছে ঃ এই পৃথিবীর দৃশ্য-গন্ধ-গান সবটুকু গ্রহণ করে প্রাণের রথ চলেছে রূপ থেকে অরূপে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মহা-জীবনের পথযাত্রা।

রবীন্দ্রনাথের প্রতীক ও বক্তব্যভিত্তিক নাট্যকৃতির এক বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর 'রক্তকরবী'। 'রক্তকরবী'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই বলেছেন ঃ "যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আসছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী, ভুলেছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে। এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত

www.pathagar.com

করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বদ্ধ জালকে। তখন সেই নারী শক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙ্গে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল এই নাটকে তাহাই বর্ণিত আছে।" যক্ষপুরের রাজা বস্তুত বর্তমান যন্ত্রভিত্তিক সভ্যতার প্রতীক। কবির কথায় এই সভ্যতা 'আকর্ষণজীবী', কারণ, শোষণ ও আহরণ করাই এ সভ্যতার ধর্ম। হিংসাদ্বেষদ্বন্দ্বময় এই সভ্যতা এতদ্দেশের পুরনো প্রেমমাধুর্য আনন্দময় 'কর্ষণজীবী' সভ্যতাকে দলিত পর্যুদস্ত করে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেছে। ফলে, মানুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে এক দুঃসহ অবস্থা, যার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, 'রক্তকরবী'র নাট্যকারের মতে— নির্বাসিত মানবতাকে ফিরিয়ে এনে প্রেমরাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা। 'নন্দিনী' এই প্রেমানন্দদাত্রী মানবতার প্রতীক।

এমনি চমৎকার বক্তব্যে 'রক্তকরবী' অপূর্ব শোভাময়। কিন্তু জন-সাধারণের পক্ষে এর সৌন্দর্য অনুভব করা যথেষ্ট কষ্টকর। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, এ নাটকে 'দন্তস্ফুট' করা সাধারণের সাধ্যাতীত। "সুতরাং এই নাটক তাহাদের চিত্তে যে কোনরূপ রেখাপাত করিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। তাহারা চায় সহজবোধ্য মনোরম কাহিনী। এই জন্যই আমাদের পুরাণকারগণ দুরূহ ধর্মতত্ত্বসমূহ চিত্তাকর্ষক গল্পের সাহায্যে প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের মতে রামায়ণের কাহিনীটিও এইরূপ কাহিনী। তিনি বলেন, 'নবঘনশ্যাম রামচন্দ্র আমাদের প্রাচীন যুগের কর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতীক, আর অভাগা 'দশমুণ্ড বিশ হাতওয়ালা' রাবণ বর্তমানকালে বহুগ্রাসী বহুসংগ্রহী সভ্যতার প্রতীক। 'রাম' শব্দের অর্থ আরাম, আর 'রাবণ' শব্দের অর্থ চীৎকার, অশান্তি। রাবণ দানব শক্তি বলে 'বিদ্যুৎবজ্রধারী' দেবতাদিগকে আপন প্রাসাদ দ্বারে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাদের দ্বারা কাজ আদায় করিত। তাহার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিত, কিন্তু তাহার দেবদ্বেষী সমৃদ্ধির মধ্যে এক মানবকন্যা আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি ধর্ম জাগিয়া উঠিলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়া তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করিলেন। ধনিকেরা এ যুগের রাক্ষস, আর শ্রমিকেরা বানর। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ এখন চলিতেছে, কিন্তু রামায়ণ যুগের মতই যে এ দ্বন্দ্বের শেষ ফল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।' ...কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন কবিগণের এরূপ ভক্ত হইয়াও তাঁহাদের পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই রামায়ণের গল্পের মত এক মনোহর কাহিনী সৃষ্টি করিয়া

www.pathagar.com

নাটকটি রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই—বোধ হয়, ইচ্ছা করিয়াই করেন নাই। এমন কি, তিনি বলিয়াছেন, যাহা গূঢ় তাহা গূঢ় রাখাই সমীচীন। ফলে এমন একটি সামাজিক সমস্যামূলক শিক্ষাপ্রদ নাটক সাধারণের নিকট যক্ষের ধনের ন্যায় অনধিগম্য হইয়া রহিয়াছে।" (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃঃ ১৮৮)।

এখানে অনেকটা জনান্তিকে বলে রাখা যায়, আজকের দিনে প্রযোজনার চমৎকারিত্বে 'রক্তকরবী'র অভিনয় দর্শকের প্রিয় হয়ে উঠেছে। এবং আজকের দিনে রবীন্দ্র-নাট্যের মঞ্চ সাফল্যের প্রেক্ষিতে অধ্যাপক বসুর বক্তব্য পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগাতে পারে। তাই, আবারও বলছি—আমার এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত 'আমাদের' নাট্য-অভিজ্ঞতা ও নাট্য-সংস্কারে এতদিন প্রচলিত এবং অভিনীত বাংলা মঞ্চ-নাট্যের যে প্রভাব তার একটা ধারণা করা। সেদিক থেকে বলা যায়, আমাদের আলোচ্য সময়টায় রবীন্দ্র-নাট্য অভিনেয় নাট্যকৃতি বলে স্বীকৃত ছিল না। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত 'নাটক ও নাট্য-আন্দোলন' গ্রন্থে গঙ্গাপদ বসু বলেন ঃ "তাঁকে (রবীন্দ্রনাথকে) আমরা বোঝবার চেষ্টা করিনি এইটিই সত্য। এবং দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, আজ পর্যন্ত সত্য। ...তাঁর সৃষ্টির মাধুর্যলোকের অনুশীলিত সত্য আমাদের কাছে দূরাগত বংশীধ্বনির মতই মধুর, কিন্তু অস্পষ্ট।" (আনন্দধারা প্রকাশন, পৃঃ ৯৭)। মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য সূক্ষ্ম রসানুভূতির কাছে যে রবীন্দ্র-নাট্যের আবেদন সে-রসানুভূতি আলোচ্য সময়টায় যে মোটেই বিস্তার লাভ করে নি, তা তো আর বলার আপেক্ষা রাখে না।

রবীন্দ্র-নাট্যে আমরা পাই চমৎকার সব ভাব-গুচ্ছের অপূর্ব সমাহার। কিন্তু সাধারণের পক্ষে তা উপলব্ধি করা অনেকটা কষ্টকর বৈকি! তাই আমাদের আলোচ্য সময়টি (১৯৪৭ সাল পর্যন্ত) রবীন্দ্র-নাট্য পঠনীয় সৎ-সাহিত্য বলেই বিবেচিত হয়ে এসেছে। আমাদের নাট্য-অভিজ্ঞতায় তার তেমন কোন অবদান অন্তত সেদিন পর্যন্ত ছিল না। বিশেষ করে আলোচ্য সময়ে মঞ্চে অভিনেয় নাট্য-অভিজ্ঞতায় আমাদের যতটুকু সঞ্চয় তা কলকাতাকেন্দ্রিক বিশ শতকী পেশাদার থিয়েটারের নাট্যকৃতি থেকে। শেষের দিকে আরম্ভ হয়েছে গিরিশ-যুগ, তার অবসানে নাট্যাঙ্গনে এসেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি নাট্যকারেরা। ক্রমে আরম্ভ হয়েছে গিরিশোত্তর এযুগ। দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন খুবই উত্তপ্ত। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের শুরু তা স্বদেশী আন্দোলনের পথে চলে চলে বিপ্লবী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে। প্রায় ৬ বছর পর ভঙ্গ বঙ্গ আবার জোড়া

www.pathagar.com

লেগে গেছে। তিক্ততর হয়েছে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক। আর ওই সময়টায় নাট্যমঞ্চে জোয়ার বইছে পূর্বোল্লেখিত সেই সব 'ঐতিহাসিক' নাটকের। জোরদার থেকে আরও জোরদার হচ্ছে 'হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি'র আবেদন। ওই সময়ে কলকাতাকেন্দ্রিক আবেগ-উদ্বেলিত যে নাট্যধারা, তারই স্রোত ক্রম-বর্ধিত বেগে প্রবাহিত হয়েছে সারা দেশে।

'আমাদের' এই জনপদে ততদিনে প্রতি জেলা ও মহকুমা শহরে, এমন কি থানা শহরেও, ইংরেজ সরকারের আমলা-কর্মচারীরা সুপ্রতিষ্ঠিত নব যুগের 'আধুনিক নাগরিক কালচারে'র জীবন-ধারায় যথেষ্ট অভ্যস্ত এবং সুস্থিত। এমনি জীবন-ধারায় অভ্যস্ত ও সুস্থিত এইসব শহরের উকিল-মোক্তার-শিক্ষক-ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রেণীর পরিবার-পরিজনও। আর গ্রামাঞ্চলেও বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ-সৃষ্ট জমিদারদের প্রাসাদ, জমিদারী সেরেস্তা—এককথায় শহরোপম রোজগারখানা। এবং অনেক জমিদারেরই কলকাতায় অন্তত একটি করে বিলাস-খানা। কলকাতার নাট্য-স্রোত এসে সজীব করে তুলছে এইসব শহর ও গ্রামাঞ্চলের জমিদারী কেন্দ্রগুলোকে। উল্লেখ্য যে, এইসব শহর ও জমিদারী কেন্দ্রগুলোর 'আধুনিক কালচার'সম্পন্ন অধিকাংশই, প্রায় সবাই, ছিলেন ধর্মীয় পরিচয়ে হিন্দু। উক্ত স্থানগুলোতে তখন গড়ে উঠছে নাট্যপ্রতি ঠান এবং স্থায়ী বা অস্থায়ী সৌখিন নাট্যমঞ্চও। নাটকে অংশ নিচ্ছেন ওইসব 'আধুনিক কালচার'সম্পন্ন পরিবারের লোকেরা। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পৌরাণিক ও 'ঐতিহাসিক' নাটকই মঞ্চস্থ হচ্ছে বেশি. নানা পূজা-পার্বণ ও উৎসবাদি উপলক্ষে। তাতে মুসলমান কোন নাট্যকর্মী অংশ গ্রহণকারী ছিলেন না বললেই চলে। হিন্দু দর্শকদের মত কিন্তু মুসলমানও সেসব নাটক দেখতে যেতেন। এসব নাট্যাভিনয়ের কুশীলবদের কেউ কেউ মাঝে-মধ্যে কলকাতা গিয়ে না ক দেখে আসতেন এবং দেখে দেখে শিখেও আসতেন কিছুটা। তাঁরা ফিরে এসে আবার দলভুক্তদের শেখাতেন। আবার তাদেরটা দেখে দেখে যতটুকু নাট্য-অভিজ্ঞতা লাভ করার লাভ করতেন দর্শকরা, এবং সেই সঙ্গে মুসলমান দর্শকরাও। কলকাতার কাছাকাছি শহরগুলোতে এবং অন্যত্রও কখনো কলকাতা থেকে পুরো নাট্যদল এসে নাট্য-প্রদর্শন করে যেতেন। তাতেও 'আমাদের' অভিজ্ঞতার সঞ্চয় কিছুটা বৃদ্ধি পেত।

"উনিশ শতকে, কলকাতার পর, শহর হিসেবে, অবিভক্ত বাংলায় ছিল ঢাকার স্থান। ঐ শতকের মধ্যভাগে বা তার কিছু পরে কলকাতা থেকে থিয়েটার ছড়িয়ে পড়ে মফস্বলে। সে সময়ে কলকাতার পাশাপাশি ঢাকাতেও সমান্তরালভাবে থিয়েটার চর্চা হয়েছে। কিন্তু তথ্যের স্বল্পতাতেই সে সম্পর্কে

www.pathagar.com

আমরা কিছুই জানি না। ...বাগান বাড়ী থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করতে কলকাতায় বেশ সময় লেগেছে। অন্যদিকে কলকাতার কিছু আগেই ঢাকায় রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়ে, দর্শনীর বিনিময়ে মোটামুটি নিয়মিত নাট্যচর্চা শুরু হয়। ...কলকাতার 'হরকরা' পত্রিকার খবর অনুসারে, "নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে, 'নীল দর্পণ' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়ে ঢাকায়ই মঞ্চস্থ হয় প্রথম। সন ১৮৬১। সংবাদটির সূত্র ধরে বলা যেতে পারে, 'নীল দর্পণে'র আগেও ঢাকায় অভিনয় কার্য কিছু হয়েছে। কিন্তু এসব ছিল শখের অভিনয়।" (ঊনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার, মুনতাসীর মামুন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯, পৃঃ ক, ঙ, ১০)।

এবার মুনতাসীর মামুন রচিত 'ঊনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার' নামক গ্রন্থ থেকে আরও কিছু উদ্ধৃতিঃ "কলিকাতা অঞ্চলে অভিনয়ের কিরূপ হুজুক পড়িয়াছে, পাঠকগণ অবগত থাকিতে পারেন। ...কলিকাতা হুজুকের উৎস স্বরূপ, তথা হইতে উৎসারিত হইয়া অন্যান্য নগরোপনগর ও গ্রামাদিতে উহা পরিব্যাপ্ত হয়। ...আমাদিগের ঢাকা [য়]...আজকাল নাটকাভিনয়ের নিতান্ত ধুম পড়িয়াছে।" (ঢাকা প্রকাশ, ১৬. ৭. ১৮৭৩—মুনতাসীর মামুন রচিত 'ঊনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার', ১৯৭৯, পৃঃ ৯ থেকে উদ্ধৃত)।

"১৮৭০-৭২ সনের মধ্যে ঢাকায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রথমে একটি হল স্থাপিত করা হয়, সেখানে একটি বাঁধা ষ্টেজও ছিল। ...'ঢাকা প্রকাশ' -এর একটি সংবাদ এই ধারণাকে আরো দৃঢ় করে '...প্রথমতঃ রামাভিষেক নাটকাভিনয়ের নিমিত্ত নানা স্থানীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা এক প্রধান অভিনেতৃ দলের সৃষ্টি হয়।' ...এটি (পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি) স্থাপন করেছিলেন মোহিনী মোহন দাস (সবজি মহলের জমিদার), অভয় দাস (উকিল), মতিলাল চক্রবর্তী (নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত), রাম চক্রবর্তী (উকিল), দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশ গাঙ্গুলী। এই হলে 'পূর্ববঙ্গ নাট্য সমাজ' মঞ্চস্থ করে তাদের প্রথম নাটক 'রামাভিষেক'। ...টিকেটের হার ছিল চার টাকা, দুই টাকা এবং এক টাকা।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১)। অন্যদিকে কলকাতায় টিকেট বিক্রি করে নাটক দেখানো হয় ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর।

"ঢাকার থিয়েটার সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে বলা যায়, পেশাদারী নাট্যসংস্থা গঠনের মনোভাব নিয়ে প্রথম যে দলটি গড়ে ওঠে, তা হচ্ছে 'প্রাইড অব বেঙ্গল থিয়েটার'। পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি ভাড়া নিয়ে তারা নাটক মঞ্চস্থ করতেন। ...সত্তরের দশক থেকে ঢাকায় একটি দু'টি

www.pathagar.com

করে পেশাদারী নাট্য সংস্থা গড়ে ওঠে। অবশ্য এসবগুলিই ছিল স্বল্পায়ু। ...নব্বই দশকে, ক্রাউন ও ডায়মন্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সত্যিকার অর্থে ঢাকার পেশাদারী থিয়েটার জমে ওঠে। এবং সে ধারা বিংশ শতকের বিশ দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯)।

"ঢাকায় গত শতকে যে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে সেগুলোর একটি খতিয়ান নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ নাটকের বিষয় বস্তু পৌরাণিক বা অন্য কথায় বলা যেতে পারে যাত্রার উন্নত রূপ যা দেখে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল, 'কল্পনামূলক নাটক অপেক্ষা ঢাকায় পুরাণ ঘটিত উৎকৃষ্ট নাটকের সমাদর অধিক'। কলকাতাতেও এর খুব একটা রকমফের হয় নি।" (উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটায়, মুনতাসীর মামুন, ১১, পৃঃ ৩১)। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর মামুন অজিত কুমার ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ডক্টর ঘোষের মতে, "মাইকেল দীনবন্ধুর নাটকে যে প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারমূলক দৃষ্টি ভঙ্গী ছিল তার সঙ্গেও ১৮৭২ সনের পরবর্তী সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গীর কোনোই যোগ ছিল না। ওই সময়ে সনাতন আদর্শের পুনঃ স্থাপনা ও পুরাতন সামাজিক মূল্যগুলো সংরক্ষণের দিকেই সমাজের ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। ...মাইকেল দীনবন্ধু যুগের প্রতিবাদ ভাঙ্গনের দিকে তখনকার সমাজের আগ্রহ ছিল না, আধ্যাত্মিক ভাবের পুনরুদ্বোধন পুরাতন সমাজ-নীতি ও আদর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠার দিকেও তখনকার সমাজের ঝোঁক দেখা গেল।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩১-৩২)।

নগরাঞ্চলের বাইরে তখন যাত্রা খুবই জনপ্রিয়। বাংলার জনসাধারণের জন্য অন্যতম আনন্দানুষ্ঠান ছিল যাত্রা। এমন কি নগরাঞ্চলেও এই যাত্রার জনপ্রিয়তা মোটেই কম ছিল না। মুনতাসীর মামুনের গ্রন্থ থেকে আমরা আরও জানতে পারি ঃ

"হৃদয়নাথ লিখেছেন, যাত্রার জন্য ঢাকা ছিল বিখ্যাত। 'সীতার বনবাস' হলো ঢাকার প্রথম যাত্রা। তারপর একরামপুর থেকে 'স্বপ্নবিলাস' নামে একটি যাত্রা মঞ্চস্থ হলো। এই যাত্রা শহরে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। 'স্বপ্নবিলাস' এর সাফল্যের পর একরামপুর থেকে পরপর মঞ্চস্থ করা হলো 'রায় উন্মাদিনী' ও 'বিচিত্র বিলাস'। নবাবপুরের বাবুদের তখন বেশ নাম ডাক। যাত্রা প্রতিযোগিতায় তারাও পিছিয়ে থাকতে চাইলেন না। তাদের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হলো 'নারদ সম্বাদ' ও 'প্রভাস নানা'। তারপর একে একে মঞ্চস্থ হলো 'ধনকুন্ড' 'নৌকাকুন্ড' এবং 'ব্রাহ্মের গীতা'। কিন্তু এর কোনটিই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। ঢাকার শেষ এ্যামেচার

www.pathagar.com

যাত্রা 'কোকিল সংবাদ'। সুভড্যার কয়েকজন তদ্রলোক মিলে এর আয়োজন করেন। শহরে ছয়মাস এবং গ্রামাঞ্চলে প্রায় এক বছর ধরে 'কোকিল সংবাদ' চলেছিল।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪)।

'শহরের ইতিকথা' গ্রন্থে (১৯৭৪) ঢাকা শহরের নাচ গান সম্পর্কে বলতে গিয়ে সত্যেন সেন ঢাকা থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্যামবাজারের জমিদার ব্রজগোপাল দাসের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। সে-মন্তব্যটি হচ্ছে ঃ

"পাশ্চাত্যের নকল থিয়েটারের পীঠভূমি কলকাতা। আর কলকাতার নকলের পীঠভূমি ছিল ঢাকার থিয়েটার। এ ব্যাপারে এখানে মৌলিকত্ব বলতে কোন কিছুই ছিল না, না জেনে না বুঝে নকল। পরিকল্পনা মঞ্চ স্থাপত্য—এসবের কোন ধার ধারা হত না। নকলের নকল যা হয় তাই। ...এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু—এটাই ছিল মূল কথা। ভাল প্রোডাকশান হলে দর্শকরা তার মধ্যেই নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলতো।" (পৃঃ ২৯)। নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমবেশি ঢাকারই মত অবস্থা বিরাজমান ছিল সমগ্র বাংলায়, আমাদের এতদঞ্চলেও।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, তখনকার ঢাকা শহরে কিশোরীলাল রায় চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার ও রাখাল চন্দ্র বসাক প্রতিষ্ঠিত ক্রাউন থিয়েটারের কথা, ময়মনসিংহ শহরে অমরাবতী নাট্যমন্দিরের কথা। এমনি সকল শহরেই এক বা একাধিক নাট্য-প্রতিষ্ঠান ও নাট্য-মঞ্চের সৃষ্টি হয়েছিল তখন। (ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার কিছুকাল পরে 'কাদের সরদার' নামে পরিচিত মির্জা আবদুল কাদির সাহেবের কর্তৃত্বে চলে আসে।)

এই-ই ছিল 'আমাদের' এ-জনপদের নাট্যমোদীদের নাট্য-ধারণা লাভের বাস্তব উৎস। এবার মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই নাট্য-অভিজ্ঞতা ও নাট্য-ধারণা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য নিবেদন করা যেতে পারে। কলকাতা থেকে প্রবাহিত যে নাট্য-ধারার সঙ্গে 'আমাদের' পরিচিতি, তাতে কি 'আমাদের' সকলেই পরিতৃপ্ত হতাম ? হতাম না। মাইকেল-দীনবন্ধুর সূচনাকৃত ধারাটি তো সূচনালগ্নেই উৎসাহ আর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদপুষ্ট নতুন ধারাটি উদ্দেশ্যগতভাবেই 'আমাদের' বিপুলাংশ মুসলমানদের তো খুশী করবার কথা নয়! যখনকার কথা বলছি তখন অবিশ্যি সঙ্গতি অসঙ্গতি নির্বিশেষে যত্রতত্র হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা বেশ উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু তা যে গাছের গোড়া কেটে

www.pathagar.com

আগায় পানি ঢালার মত! তাতে কি আর কাটা গাছে প্রাণ সঞ্জীবিত হয়? তদুপরি, রাজনৈতিক মঞ্চে ততদিনে দুই পক্ষের লড়াই বেশ জমে উঠেছে। সে লড়াইয়ের প্রভাবে 'আমাদের' বিপুলাংশের নীরব প্রতিবাদী মনগুলো তখন ভালো করেই বেঁকে বসল। সচেতনভাবেই আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ওসব নাটকে আমাদের জীবন-কথা নেই, আমাদের মন-মানসের প্রতিফলন নেই। কারণ বিশেষে মর্মাহত হয়ে রাগারাগিটা কম করি যারা, তারা ভাবলামঃ নাট্যাঙ্গনে হিন্দুরাই যখন কর্মরত, তাঁরাই যখন নাটক লিখছেন, নাটক করছেন, তখন তাঁরা তো নিজেদের কথাই বলবেন। নেহায়েত প্রয়োজনে আমাদের কথা বললেও সে-বলাটা হবে ভাসা-ভাসা। আমাদের কথা লিখবার জন্য আমাদের নাট্যকার কোথায়? আমাদের নাট্যমঞ্চ কোথায়? অভিনয়-শিল্পী কোথায়?

এবার আসা যাক নাট্য-সংস্কারের কথায়। আর এ সম্পর্কে কিছু বলতে যেয়ে ভাবছি এ দেশীয় নাট্য-সংস্কার বিষয়ে ইতিপূর্বেই জ্ঞানী-গুণীরা যা লিখেছেন তার থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই কাজটা সারা যাক। 'বাঙ্গালী ও তাহার নাট্য-সংস্কার' সম্পর্কে স্মরণ আচার্য লিখেছেনঃ "সংস্কৃত নাটকের প্রচণ্ড আভিজাত্য বাঙালীকে সহজ প্রবেশাধিকার তো দেয়ইনি, উপরন্তু নাট্যসম্পর্কিত নটনটীদের সম্পর্কে একটি বদ্ধমূল হীন সংস্কারের সূচনা করেছে এই যুগ থেকেই। রঙ্গ জগতের নটনটীদের প্রাচীন জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ কোনদিই সুদৃষ্টিতে দেখেননি। কোন নট বা নটীর দেওয়া ফল পর্যন্ত ব্রাহ্মণের ভোগ্য ছিল না। ...একথা সত্য যে প্রাচীনকাল থেকেই গীতবাদ্যের প্রচলন সর্বদেশেই সর্বসমাজেই নানারূপে প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে সমাজের উচ্চবর্ণেরা কোনদিনই গীত, বাদ্য বা অভিনয়কে সুদৃষ্টিতে দেখেননি। উচ্চ কোটির নর-নারী নট-নটী বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, এ উদাহরণ বিরল। বরং প্রাচীন পুরাণগুলিতে নটনটীদের 'একঘরে' করা হয়েছে।" (দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৫, পৃঃ ২২৭-২২৮)।

স্মরণ আচার্য বিশেষ করে প্রাচীনকালের নাট্য-সংস্কারের কথাই বলেছেন। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে কলকাতার নাট্যানুষ্ঠানের প্রতি হিন্দু সমাজের যে বিরূপতা ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেনঃ "সম্প্রদায়বিশেষের কোন ভদ্র ব্যক্তিরাই বাঙলা থিয়েটারে যাওয়ার প্রস্তাবে বিরোধী। তাঁহারা অবশ্য সদুদ্দেশ্যে উক্ত মত প্রচার করেন। কে অস্বীকার করিবে যে, বাঙলার রঙ্গভূমি সমুদয় যেরূপ

www.pathagar.com

উপাদানে গঠিত, তাহাতে উহাতে গমন করা তরলমতি বালক বা যুবকের নৈতিক উন্নতি হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই, বরং বিপরীত সম্ভাবনা।" (ভারতী, মাঘ, ১৩০২)। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অবিশ্যি উপরোক্ত বিরূপ অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে নাট্যানুষ্ঠানের সপক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা জানলাম, তখনকার হিন্দুসমাজও নাট্যানুষ্ঠানের সপক্ষে ছিল না।

নাট্যক্রিয়াদির প্রতি এমনি মনোভাব যে শুধু এদেশেই বিদ্যমান ছিল তা নয়, এমনি মনোভাব বিদ্যমান ছিল ষোল শতকের ইংল্যাণ্ডেও। শেকসপীয়রের অভ্যুদয়-পূর্ব সময়টায় নাট্যাভিনয়ের অবস্থাটা খুব সুশৃংখল ও সম্মানজনক ছিল না। নাটকের দলগুলো ছিল ভ্রাম্যমান, বিভিন্ন স্থানে তারা অভিনয়ানুষ্ঠান করে বেড়াত—মার্কেট-স্কোয়ারে, বড় লোকদের প্রাসাদ-হলে, সরাইখানার অঙ্গনে ইত্যাদি নানা স্থানে। নট-নটীরা ছিল প্রায় যাযাবরের মত। রাণী এলিজাবেথের সিংহাসনারোহণের পর এই অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। অভিজাত শ্রেণীর লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা দলভুক্ত হতে থাকে। "In 1572 Parliament passed an Act for the Punishment of Vagabonds and only those companies of players who enjoyed the patronage of the nobility were allowed to tour the provinces. The companies took on the names of their patrons and became "Pembroke's Men", "Leicester's Men", "The Lord Admiral's Men" and so on, and with this new-found self respect the actors gained the sympathy and amiration of the nobility and the common people .. ... Many, however, considered the theatre to be a source of sin and corruption, and preachers warned the young to keep away from such places. An outbreak of plague in London was to support their allegation." (The Life and Times of Shakespeare, Paul Hamlyn, London etc. pp. 28–29)।

তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নাট্য-সংস্কার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডক্টর মামুন বলেছেনঃ "রক্ষণশীল চিন্তার ধারক—হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান সব সম্প্রদায়ই থিয়েটারকে বাধা দিয়েছে। অন্যদিকে আবার ঐ সময়ের তুলনায় যারা লিবারেল, সে যে সম্প্রদায়ের হোক না কেন থিয়েটারের পক্ষ অবলম্বন করেছে। তারা থিয়েটারকে দেখেছেন

www.pathagar.com

সংস্কারের মাধ্যম হিসাবে। বিনোদনের একটি নির্মল উপায় হিসাবে। ...কিন্তু তা সত্ত্বেও অদ্ভূত ধরণের এক নৈতিকতা বোধ এ দুই দলের মধ্যে কাজ করেছে। তা'হলো ছাত্রদের থিয়েটার দেখা অপছন্দ করা। এমন কি ১৮৯৯ সনে দেখা যাচ্ছে কমিশনার ছাত্রদের থিয়েটারে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন।" (ঊনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার, ১৯৭৯, পৃঃ ৩০-৩১)।

এবার এ জনপদে 'আমাদের' বিপুলাংশ অর্থাৎ মুসলমান সমাজের নাট্য-সংস্কারের আরও একটি দিক। আমার রচিত দ্বিতীয় নাটক 'পদক্ষেপ'-এর ভূমিকায় (১৯৫২ সালে) বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক মরহুম ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছিলেনঃ "নানা কারণে মুসলমান সমাজে নাট্য-সাহিত্য বিকাশের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ বছর আগের কথা বলছি, মুসলমানের পক্ষে—অর্থাৎ মুসলমান ছেলেদের পক্ষে—নারী-চরিত্র অভিনয় করা নিষিদ্ধ বা হারাম বলে গণ্য করা হত। মনে আছে, একবার ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে 'বঙ্গনারী' অভিনয় করার সিদ্ধান্ত যদি বা গ্রহণ করা হ'ল, তা' শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেল এই জন্য যে, কর্তৃপক্ষের নির্দেশমত নারীর পার্ট বাদ দিয়ে অভিনয় করতে ছেলেরা রাজী হ'ল না।

নাটকের ভালমন্দ বোঝা যায় অভিনয় হ'বার পর। অনেক নাটক হয়ত পড়তে মন্দ লাগে না, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে ভাল উৎরায় না। এও একটি কারণ, যে জন্য মুসলমান সমাজের কেউ অনেকদিন পর্যন্ত ভাল অভিনয় যোগ্য নাটক রচনা করতে পারেন নাই। ইব্রাহীম খাঁ, শাহাদাৎ হোসেন বা ঐ সময়কার আর কারও নাটক রঙ্গমঞ্চে পরীক্ষা করে দেখা একরকম অসম্ভব ছিল। নজরুল ইসলাম কয়েকটা নাটিকা এবং একটি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু অন্যের লেখা নাটকে তিনি গান লিখে দিয়ে এবং সুর সংযোগ করেই বেশী খ্যাতি লাভ করেছিলেন।"

আমাদের নাট্য-সংস্কারের একটা ধারণা তো পাওয়া গেল। আর নাট্য-অভিজ্ঞতা ও নাট্য-ধারণার কথা আগেই বলা হয়েছে। এমনি অবস্থায়, বিচ্ছিন্নভাবে হলেও, আমাদের অনেকেরই মনে প্রবল আগ্রহঃ আমাদের নাট্যাঙ্গন আমাদেরই নির্মাণ করতে হবে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সঞ্চয় তেমন কিছু নেই, তবুও। নাট্য-সংস্কারের বাধা? যেমন করে হোক অতিক্রম করতে হবে।

www.pathagar.com

চল্লিশের দশকের শেষ দিক। রাজনৈতিক মঞ্চে প্রবল উত্তেজনা। ইতিমধ্যে কলকাতা বেতারে মুসলমান নাট্য-শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে: অভিনয়ের ক্ষেত্রে তার প্রধান পুরুষ নাজির আহমেদ। সঙ্গে আছেন ফতেহ লোহানী, কাজী খালেক, নূরুল আনাম খান, নূরুল ইসলাম প্রমুখ তরুণেরা। দেশের নানা স্থানে আরও আছেন উৎসাহী তরুণ নাট্য-শিল্পী। নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন কাজী নজরুল ইসলাম, কবি শাহাদাৎ হোসেন. ইব্রাহীম খাঁ, নূরুল মোমেন, আবুল ফজল, আকবর উদ্দিন, মোহাম্মদ আবদুর রহমান, মোঃ ইসহাক রেজা চৌধুরী প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকরা। এঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের নাটক রচনার প্রয়াস অবশ্য অন্যান্যদের নাট্য-প্রয়াসের মত একই উদ্দেশ্য-জাত নয়। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে বক্তব্যে ফিরে আসি। আমি তখন একেবারেই মফস্বলে। কলেজে পড়ি, অভিনয় করি। চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে সামাজিক নাটক 'বিরোধ' রচনা করে ফেললাম এবং তা অভিনীতও হল ছোট্ট মফস্বল শহরে।

এবার ১৯৪৭ সালের আগে বাংলাদেশ অঞ্চলের অধিবাসী যাঁরা নাটক রচনা করেছিলেন এবং প্রকাশিত হয়েছিল তার একটা খতিয়ান তুলে ধরছি।

কাজী নজরুল ইসলাম	:	লোককাহিনীভিত্তিক 'মধুমালা' এবং সামাজিক নাটক 'আলেয়া ও ঝিলিমিলি'।
মীর মশাররফ হোসেন	:	সামাজিক নাটক 'জমিদার দর্পণ' ও ঐতিহাসিক নাটক 'বসন্তকুমারী'।
শাহাদাৎ হোসেন	:	ঐতিহাসিক নাটক 'সরফরাজ খাঁ', 'নবাব আলীবর্দী', 'মসনদের মোহ' এবং 'আনারকলি'।
ইব্রাহিম খাঁ	:	ঐতিহাসিক নাটক 'আনোয়ার পাশা' ও 'কামাল পাশা'।
আবুল ফজল	:	সামাজিক নাটক 'আলোক লতা' ও 'একটি অকাল'।
আকবর উদ্দিন	:	ঐতিহাসিক নাটক 'সিন্ধু বিজয়'।
মন্মথ রায়	:	লোককাহিনীভিত্তিক নাটক 'মহুয়া'।
সুরেন্দ্র মোহন পঞ্চতীর্থ	:	ঐতিহাসিক নাটক 'বঙ্গ গৌরব হোসেন শাহ্'।

www.pathagar.com

রমেশ গোস্বামী	ঃ	ঐতিহাসিক নাটক 'কেদার রায়'।
বন্দে আলী মিঞা	ঃ	ঐতিহাসিক নাটক 'আমানুল্লাহ্'।
মোহাম্মদ আবদুর রহমান	ঃ	ঐতিহাসিক নাটক 'দেবলা উদ্ধার'।
মোঃ ইসহাক রেজা চৌধুরী	ঃ	ঐতিহাসিক নাটক 'চক্রজাল'।

উপরোক্ত সবগুলি নাটকই যে মঞ্চে অভিনয়যোগ্য ছিল, তা নয়। বলতে গেলে, এসবের অধিকাংশই ছিল মঞ্চাভিনয়ের অনুপযোগী। এই খতিয়ান থেকে এটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আলোচ্য সময়টায় প্রত্যাশিতভাবেই ঐতিহাসিক নাটক বেশি রচিত হয়েছে। তবে সামাজিক নাটকের অনুপাতও কম নয়। সর্বমোট ১৯টি নাটকের কথা এই খতিয়ানে আছে। তার মধ্যে ১৩টি ঐতিহাসিক, ৪টি সামাজিক এবং ২টি লোককাহিনী-ভিত্তিক। শতকরা হিসাবে ঐতিহাসিক নাটক ৬৮·৪ ভাগ, সামাজিক নাটক ২১·১ ভাগ এবং লোককাহিনী-ভিত্তিক নাটক ১০·৫ ভাগ। এখানে বলে রাখতে চাই যে উপরোক্ত খতিয়ানটি একেবারে ত্রুটিমুক্ত নাও হতে পারে। কিছু কিছু নাট্য-প্রয়াসের উল্লেখ হয়তো এই খতিয়ান থেকে আমার জানার অভাবে বাদ পড়ে গেছে। তবু, খতিয়ানটি থেকে একথাই ধরা পড়বে যে, বাংলার এতদঞ্চলের 'আমরা'ও নাটক রচনার চেষ্টা করেছিলাম।

তারপর কালপ্রবাহে একদিন এসে গেল উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের চৌদ্দই আগষ্ট। পরের দিন পনেরই আগষ্ট। রাজনৈতিক মঞ্চে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াজাত দ্বি-রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্ত।

---

www.pathagar.com

এগারো/সাতচল্লিশোত্তর আমাদের মঞ্চ-নাট্য

দ্বি-রাষ্ট্রীয় বন্দোবস্তে ১৯৪৭ সালের চৌদ্দই আগষ্ট পাকিস্তানের সৃষ্টি হল। বিভক্ত হয়ে গেল বৃটিশ আমলের বাংলা দেশ। এ-যাবত বাংলা নাট্যান্দোলন ও নাট্যাভিনয়ের পীঠভূমি কলকাতার সঙ্গে আমাদের এই জনপদের সম্পর্ক বলতে গেলে ছিন্নই হয়ে গেল। পূর্ববাংলার 'প্রাদেশিক রাজধানী' এই ঢাকা নগরী হল আমাদের জন্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ডের কেন্দ্রস্থল। মনে রাখতে হবে, তখনকার ঢাকা নগরী একটা জেলা শহর মাত্র। পেশাদার-অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী দূরের কথা, এমন একটা সাধারণ মিলানায়তনও ছিল না ঢাকায় যেখানে সাময়িকভাবেও দর্শকদের সম্মুখে কোন নাট্যানুষ্ঠান করা যেত। ঢাকা শহরের আগেকার নাট্যোম্মাদনা ততদিনে থিতিয়ে এসেছে। নাট্যানুষ্ঠানের কর্মকান্ড বলতে গেলে চল্লিশের দশকে এক রকম শেষই হয়ে গেছে। নাট্যক্ষেত্রের অবস্থাটা তখন কেমন ছিল? অন্যান্য মফস্বল শহরের মতই। ইনি বা তিনি সুযোগ পেলে নাটকে নাটকে অভিনয় করতে থাকেন—এমন কেউ কেউ ছিলেন এখানে সেখানে। সর্বজনাব নাজির আহমেদ, হাবিবুল হক, ফতেহ্ লোহানী, কাজী খালেক, বিনয় বিশ্বাস, রণেন কুশারী প্রমুখ নাট্য-ব্যক্তিত্ব তখন ঢাকায় সমবেত হলেন (প্রধানত বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে) যাঁরা সাতচল্লিশের আগে থেকেই নাটক, নাট্যাভিনয় ও সিনেমার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কলকাতার নাট্যা-ভিজ্ঞতা নিয়ে ঢাকায় আরও এলেন সর্বজনাব নূরুল আনাম খান, আবদুল মজিদ, নূরুল ইসলাম এবং আরও দু'একজন। কিন্তু এঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন এখানে-সেখানে, ব্রতশীল নাট্যসাধনার জন্য সংগঠিত ছিলেন না। একমাত্র নাজির আহমেদ ছাড়া প্রায় সবারই নাট্য-জ্ঞানের ভান্ডারে সঞ্চিত তখন কলকাতার প্রমোদ নাটকের কিছু সঞ্চয়। জনাব নাজির আহমেদ ছিলেন বিদেশী নাটকের সঙ্গে পরিচিত এক নাট্য-ব্যক্তিত্ব। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, আধুনিক নাটকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য তিনিই জনাব ফতেহ্ লোহানীকে লন্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তিনিও শিক্ষা সমাপনের

www.pathagar.com

আগেই চলে আসেন দেশে। অগত্যা নাজির আহমেদ সাহেব রেডিওকে কেন্দ্র করেই আমাদের নাটকের শূন্য ভাণ্ডারে কিছু পুরে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত।

কালে-ভদ্রে ঢাকায় তখন এখানে-সেখানে নাট্যানুষ্ঠান হয়। তা-ও কলকাতার সেই প্রমোদ নাটক। এক বা দু'-রাত্রির জন্য সে-নাট্যানুষ্ঠানকে কোন রকমে ম্যানেজ করা হয় মাত্র। কলকাতায় চল্লিশের দশকে যে নাট্যান্দোলন, তার সঙ্গে এখানকার কারুরই তেমন সংযোগ ছিল না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতা তথা পশ্চিম বঙ্গের সে-নাট্যান্দোলনে এগিয়ে এসে-ছিলেন প্রধানত সেখানকার কমিউনিষ্ট পার্টির অনুসারীরাই। আই. পি. টি. এ. বা গণনাট্য সংঘ ছিল সে-আন্দোলনের সংগঠক। ঢাকায় তখনো তার ঢেউ ততটা এসে লাগেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-ব্যক্তিত্বরা সাতচল্লিশের কিছু আগে এবং পরে-পরেই ইণ্ডিয়ায় চলে গেছেন। সব কিছু তখন নতুন করে আরম্ভ করার পালা। এমন কি, মাহবুব আলী ইনিষ্টিউটের মত রেল-কর্মীদের নাট্যমঞ্চসম্পন্ন মিলনায়তনটিতেও তখন পাকা প্ল্যাটফর্মটি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রমোদ নাটকের সেইসব পটে আঁকা দৃশ্যাবলী, উইংস্, সাজসজ্জা, নাট্য-সংগ্রহ সব কিছু উধাও। হিন্দু ছাত্রদের জন্য নির্মিত ঢাকা হলে জগন্নাথ হলে আগে বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান হত জাঁকজমকের সঙ্গে (কলকাতার সেই প্রমোদ নাটক)। তা-ও ফাঁকা। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে নাট্যাভিনয়ের বাসনা জাগলে তার পরিচালনার জন্যে ধর্না দিতে হত রেডিওর সঙ্গে জড়িত পূর্বোক্ত নাট্য-ব্যক্তিত্বদের কাছে। তাঁরা আবার প্রধান প্রধান চরিত্রাভিয়ের জন্য তাঁদের মধ্য থেকেই কাউকে কাউকে নিতে হবে বলে শর্ত উত্থাপন করতেন। এমনি এক পরিস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের এক ফাংশনের জন্য তখনকার ছাত্র মুনীর চৌধুরীরই স্বরচিত একাঙ্কিকা তাঁরই নেতৃত্বে ও পরিচালনায় অভিনীত হয়, এবং সাফল্যের সঙ্গেই। আর একটি ঘটনার কথা বলছি। তাতে আমার নাম জড়িত থাকলেও বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে— তখনকার নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থার একটা খণ্ড চিত্র তুলে ধরা। ১৯৪৯ সালে ফজলুল হক হলে বার্ষিক নাট্যাভিনয়ে আমার প্রকাশিত প্রথম নাটক 'বিরোধ' মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে। ছদ্মনামের জন্য নাট্যকার হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। হল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে 'বিরোধ'-এর নির্বাচন করেছিলেন সর্বজনমান্য ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্। তাঁর নাকি যুক্তি ছিলঃ মুসলমান সমাজ নিয়ে মুসলমান রচিত এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটির মঞ্চায়ন প্রয়োজন। এর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় পরলোকগত দুই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সর্বজনাব মুহম্মদ আবদুল হাই

www.pathagar.com

(বাংলা বিভাগ) ও জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার (ইংরেজী বিভাগ) উপর। শেষ পর্যন্ত জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব একাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। কার্জন হলে ষ্টেজ বেঁধে মঞ্চস্থ হচ্ছে 'বিরোধ'। নাট্যারম্ভে হলের প্রভোষ্ট ডক্টর আবদুল হালিম মঞ্চে এসে হাত জোড় করে (আক্ষরিক অর্থেই) দর্শকবৃন্দের কাছে অনুরোধ জানালেন ঃ এই প্রথম মুসলমান সমাজের উপর একজন মুসলমান নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে। দর্শকদের চোখ-কানের অভ্যাসে হয়তো বিসদৃশ নাড়া লাগবে। তাঁরা যেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিয়ে নাট্যাভিনয়ের পুরোটাই দেখে যান। অর্থাৎ বিরক্ত হয়ে চলে না যান।

ঝাড়া সাড়ে চার ঘন্টার নাটক। সেই পুরনো প্রয়োগ-পদ্ধতিতে। না, কেউ চলে যাননি। নিজেদের নাটক মনে করেই হয়তো তাঁরা উপভোগই করেছিলেন যথেষ্ট অব্যবস্থায় মঞ্চস্থ নাটকটি। পরের রাত্রে অভিনয় অতিথিদের জন্য। তখনকার রীতি অনুযায়ী ভাল অভিনয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হত। সে-রাত্রে পুরস্কারের জন্য বিচারক-মণ্ডলীতে ছিলেন সর্বজনাব ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক অজিত গুহ ও মুনীর চৌধুরী। কাজী সাহেবের ছাত্র ছিলাম বলে এই নাটকের রচয়িতা যে আমি তা তিনি জানতেন। রীতি-অনুযায়ীই বিচারক-মণ্ডলী যখন গ্রীন রুমের পাশে 'জলযোগের' উদ্দেশ্যে মঞ্চ-এলাকায় ঢুকেছেন, তখনই তাঁদের সামনে পড়ে গেলাম আমি। অতর্কিতে। কাজী সাহেব চিনিয়ে দিলেন, মুনীর চৌধুরী আমার হাত ধরলেন। নিয়ে চললেন 'জলযোগের' জায়গায়। সে-রাত্রে যে আদর পেলাম তাঁদের কাছ থেকে, পরবর্তীতে অনেক বড় সম্মানও তার তুলনায় নেহায়েত পানশে। মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে তখন থেকেই আমার বন্ধুত্ব।

এমনি পরিস্থিতিতেই আরম্ভ হল আমাদের নাট্যচর্চা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের, বিভিন্ন কলেজের সাধারণত দু'রাত্রির জন্য বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠান। পরিস্থিতি স্বাভাবিক বা আয়ত্বাধীন থাকলে আজও যেমন হয়। তাছাড়া, ঢাকায় বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হত, যেমনটি করা হয় আজও। আলাদা কোন প্রদর্শনী গৃহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যানুষ্ঠানগুলো হত কার্জন হলের প্ল্যাটফর্মের উপর সাময়িক মঞ্চ তৈরী করে। বাইরের নাট্যানুষ্ঠানের জন্য সাধারণত ব্যবহৃত হত মেহবুব আলী ইনষ্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউট (কিছুকাল পরে নির্মিত এবং ইসকান্দার মির্জা হল নামে প্রথম দিকে পরিচিত) প্রভৃতি। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, নাট্যানুষ্ঠানের

www.pathagar.com

জন্য ছিল তখন গোটা কতক দুর্দশাগ্রস্থ অস্থায়ী প্রদর্শনী মঞ্চের লভ্যতা, অপর্যাপ্ত শ্রুতি ও আলোক নিয়ন্ত্রণের বিরক্তিকর আয়োজন। এক কথায়, এক সমস্যাসংকুল পরিস্থিতি। আর নাটক? কলকাতার নাটকের অভিনয়ই হত বেশি করে। তবে যত দিন যেতে লাগল, আমাদের রচিত নাটকও অভিনীত হতে থাকল ক্রমবর্ধমান হারে। এমনি পরিস্থিতিতে নাটক যারা লিখতাম, তারা পয়সাকড়ি কেমন পেতাম? আমার নিজের কথাই বলি। প্রানপণ চেষ্টায় টাকা জোগাড় করে সেই টাকায় রচিত নাটক ছাপাতাম। এম. এস-সি. শেষ পর্বের পরীক্ষা দিতে গিয়ে হলের পাওনা মিটিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে পড়লাম সংকটে। শেষ পর্যন্ত নিজেরই টাকায় ছাপানো ৮০০ কপি 'বিরোধ' নাটক সর্বস্বত্বসহ এক প্রকাশকের কাছে দু'শ টাকায় বিক্রি করে দিয়ে সংকট থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলাম।

নাট্যচর্চার পরিস্থিতি নির্ণীত হয় যা দিয়ে তা হচ্ছেঃ সমাজের নাট্য সংস্কার, একাজে ক্রিয়াশীলদের নাট্য-অভিজ্ঞতা, সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিবেচনা, প্রায়োগিক উপকরণের লভ্যতা, বিরাজমান প্রয়োগ-পদ্ধতি, নাট্যরচনার ক্ষেত্রে ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট সকলের নাট্য-মানস।

সাতচল্লিশের অব্যবহিত পরের সময়টায় এদেশের নাট্যসংস্কার ছিল একাজের পরিপন্থী। যে কোন স্তরেরই মেয়েদের নাট্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ছিল অকল্পনীয়। হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া নাট্যকর্মীদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। যা কিছু ছিল, তা-ও সেই প্রমোদ নাটকের। সামগ্রিক সাংস্কৃতিক বিবেচনায় তখন নতুন জাতি-সত্ত্বার জটিলতা। উৎকৃষ্ট নাট্যানুষ্ঠানের উপযোগী প্রয়োগিক উপকরণ মোটেই সহজলভ্য ছিল না, বলতে গেলে লভ্যই ছিল না। যেনতেন প্রকারে নাটক মঞ্চস্থ করার সেই সময়টাতে প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে ভাবনার অবকাশই বা থাকে কি করে? নাট্যরচনায় আমরা ব্রতী হই যখন, তখন আমাদের সামনে ইব্রাহীম খাঁর 'কামাল পাশা' জাতীয় কিছু রচনা। তা-ও বলতে গেলে শুধু পড়বার জন্যই। সর্বোপরি, সামগ্রিকভাবে কলকাতার পেশাদার নাটুকেদের নাট্যাভ্যাস থেকে ধারে পাওয়া কিছু নাট্য-জ্ঞানই তখন মোটামুটিভাবে আমাদের মানস-লোকে বিরাজমান।

দেশ-বিভক্তির পরেও সারা বাংলাদেশ জুড়ে শহরে-গঞ্জে নাট্যানুষ্ঠান হত, যেমন হত দেশ-বিভক্তির আগেও। সেসব কলকাতার প্রমোদ নাটক। ঢাকাতেও হত তা-ই। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই চিরাচরিত নাট্যাভ্যাসে সংযোজিত হল এক নতুন চেতনা।

www.pathagar.com

এদেশের নাটক চাই। কিছুদিন আগে-পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ফাঁকে নাট্যকর্মে কমবেশি নিয়োজিত ছিলাম তিনজনঃ জনাব নূরুল মোমেন, শহীদ মুনীর চৌধুরী এবং আমি। প্রখ্যাত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান সাহেব সরকারী কলেজের অধ্যাপক। তিনিও মাঝে মধ্যে নাটক লেখেন। কলকাতার 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় দেশ-বিভক্তির আগেই প্রকাশিত প্রশংসাধন্য নাটক 'নেমেসিস'-এর নাট্যকার নূরুল মোমেন তখনকার প্রথম দিকটাতে বিদেশে আইন অধ্যয়নে রত। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র (পরে বাংলা সাহিত্যেরও) পাশ্চাত্য নাটকের সহিত সুপরিচিত মুনীর চৌধুরী ছাত্র জীবনের অবসানে রাজনৈতিক টানাপোড়েনে ব্যতিব্যস্ত, মফস্বল কলেজে চাকুরিরত। আর পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ছাত্র আমি 'এদেশীয়' নাটক রচনার জন্য উৎসাহব্রতী। ধরা যাক ১৯৫১ পর্যন্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একা আমিই অধ্যাপনা ও নাটক নিয়ে চর্চা করছি। আমার নাট্য-জ্ঞানের ভাণ্ডারে কিছু সঞ্চিত তখন কলকাতার প্রমোদ নাটকের অভিজ্ঞতা। তবে ততদিনে সেখানেও পেশাদারী নাট্য ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছে আর একটি মাত্রাঃ বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বীপান্তর', 'দুই পুরুষ' ইত্যাদি। এসব নাটক শুধু অভিনেয়ত্বে নয়, সাহিত্য মূল্যেও উজ্জ্বল। সর্বোপরি বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। এদেশীয় নাটক লিখতে হবে বলে ভেবে-চিন্তে ঠিক করলামঃ নাগরিক জীবনের ড্রইংরুম মডেলের নাটক নয় (সে-জীবন তখন এখানে ছিলও না বলা চলে), আমাদের জনজীবন নিয়েই নাটক লিখব। 'দ্বীপান্তর'-এর টেকনিক আমার কিছুটা আয়ত্ত্বাধীন, কিন্তু 'নবান্ন'র টেকনিক নয়। নবান্নর অভিনয়ও দেখিনি। পুরনো টেকনিকে তাই রচিত হল আমার তৃতীয় নাটক 'বিদ্রোহী পদ্মা'। (অবশ্যই দ্বীপান্তর নবান্নর যোগ্যতা নিয়ে নয়। তবে সবদিক থেকেই এদেশীয়)।

তখনই আমাদের জীবনে এল ১৯৫২। একুশে ফেব্রুয়ারী। আমাদের জাতিসত্ত্বার বিবেচনায় সংযুক্ত হল এক নতুন চেতনা। সব-পরিচিতি অন্বেষার এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। সাতচল্লিশের অনেক প্রত্যাশা মারণাঘাতে মুমূর্ষু হল মাত্র বছর পাঁচেক যেতে না যেতেই। মাতৃভাষার দাবীতে জীবন-দান, যে কোন দেশের ইতিহাসে এ যে অভাবিত-পূর্ব, অভিনব! ফলত এর প্রভাব সংস্কৃতি ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করে বেশি করে। তদনুযায়ী নাট্যক্ষেত্রেও। বিশেষ করে নাটক রচনার ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে এসেছেন। নূরুল মোমেন সাহেবও ফিরে এসেছেন বিদেশ থেকে। একুশের ঘটনা নিয়ে মুনীর চৌধুরী লিখেছেন 'কবর'। এর পর অপ্রত্যক্ষ ভাবে একুশের চেতনা নিয়ে রচিত হয়েছে

www.pathagar.com

অন্যান্য নাটক—আমার অগ্নিগিরি, রক্তপদ্ম, অনেক তারার হাতছানি; জালা-উদ্দিন আল আজাদের মরক্কোর যাদুকর; আলি মনসুরের বোবা মানুষ; শওকত ওসমানের আমলার মামলা, কাঁকরমনি ইত্যাদি ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক। সব নাটকেই প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধিকার ও সংগ্রামী চেতনার সুর। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উদ্বোধন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের তিন নাট্যকারের মধ্যে আমিই নাটক লিখি বেশি করে। সেই নাটক বিভিন্ন ছাত্রাবাসে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করি। কম-বেশি কাজটা করি তিনজনই। আরম্ভে তো ছেলেরাই মেয়ে সাজত। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে মেয়েরাই মেয়ে হয়ে মঞ্চে দেখা দিতে আরম্ভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক-প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা অভিনয় শেখাতে সাহায্য করি। অতি অল্প সময়েই নাট্য ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এক বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নাট্য-তরঙ্গ ঢাকা নগরীর সর্বত্রই তখন দোলা দিচ্ছে। শুধু ঢাকা নগরীতে কেন, বলা চলে সমগ্র দেশেই।

বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারিক জনাব শামসুল হক সাহেব সংকলিত ও সম্পাদিত 'বাংলা সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী, ১৯৪৭—১৯৬৯'-তে অনুবাদসহ ৫৪১ খানা প্রকাশিত নাটকের তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেই তথ্য থেকে পরি-সংখ্যানগত হিসাব অনুযায়ী ১৯৪২ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই ৪ বছরে প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা ১১, ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত এই ৫ বছরে সেই সংখ্যা ৫২, ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ৯৬, ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ১৬৩ এবং ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা ২১৯। শতকরা হিসাবে প্রথম ৪ বছরে ২·০ ভাগ, পরের প্রতি ৫ বছরে যথাক্রমে ৯·৬ ভাগ, ১৭·৭ ভাগ, ৩০·১ ভাগ এবং ৪০·৫ ভাগ। স্পষ্টতই নাটক রচনার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেশি করে বেড়ে চলেছে।

ওসব নাটক যে যে স্থানে প্রকাশিত হয়েছে, তার জেলাওয়ারী শতকরা হিসাব হচ্ছেঃ ঢাকায় শতকরা ৪৭·০ ভাগ, বগুড়ায় ১৭·১ ভাগ, বরিশালে ৭·২ ভাগ, চট্টগ্রামে ৬·০ ভাগ, ময়মনসিংহে ৪·২ ভাগ, নোয়াখালিতে ৩·৫ ভাগ, কুমিল্লায় ৩·৫ ভাগ, কুষ্টিয়ায় ২·৩ ভাগ, যশোরে ১·৪ ভাগ, রংপুরে ১·৪ ভাগ, সিলেটে ১·৪ ভাগ, রাজশাহীতে ১·৪ ভাগ, খুলনায় ১·২ ভাগ, ফরিদপুরে ১·২ ভাগ, পাবনায় ০·৬ ভাগ এবং দিনাজপুরে ০·৫ ভাগ। উপরোক্ত তথ্যসমূহকে খুব নির্ভুল মনে না করলেও এটা স্পষ্ট

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে যে সাতচল্লিশোত্তর কালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা জনিত আবেগ যথেষ্ট চৈতনাসমৃদ্ধ হয়েছে, এবং তা শুধু রাজধানী ঢাকা নগরীতেই নয়—কমবেশি বাংলাদেশের সর্বত্রই। ১৯৬৩ সালে জাপানের টোকিও মহানগরীতে অনুষ্ঠিত এক ড্রামা সেমিনারে ভাষণ দিতে গিয়ে মুনীর চৌধুরী বলেছিলেনঃ "গত পনের বছরে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উল্লেখযোগ্য নাট্যগুণ সম্পন্ন পঁচাত্তরটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। আরো অধিক সংখ্যক নাটক পাণ্ডুলিপি থেকেই মঞ্চস্থ হয়েছে। বছরের পর বছর সামাজিক অবস্থা বিশেষের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা নাটক সমকালীন জীবন ধারার মূলীভূত মানবিক দোষগুণ ও সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরছে। ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জীমূলক নাটক স্পষ্টতঃ হ্রাস পেয়েছে যদিচ কখনো কখনো নাট্যকারগণ নতুন ও নিকট কিছুকে গৌরবান্বিত করার মানসে পুরনো কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এসব নাটকে হয়তো লক্ষণীয় কোন পরিপূর্ণতা আসেনি, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে এদের মধ্যে মহৎ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।"

আলোচ্য সময়ে ২৭৮ জন নাট্যকার উপরোক্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' নাটক রচনা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, ওসব নাটকের অধিকাংশই সফল মঞ্চাভিনয়ের জন্য অনুপযোগী। তার অর্থ এই যে এই ২৭৮ জন নাট্যকারের অনেকেই মঞ্চসফল নাটক রচনা করতে পারেন নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বলা যায় যে নাটক রচনার জন্য বিপুল প্রয়াস বিরাজমান ছিল সারা দেশে। গুণগত উৎকর্ষের কথা বাদ দিলে ওই সময়ে নাট্য-প্রয়াসী ও তাঁদের রচিত-প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা সেই প্রয়াসের বিপুলত্বই প্রমাণ করে। এঁদের রচিত নাটকের শ্রেণী বিভাগ করলে দেখা যায়ঃ শতকরা প্রায় ২২ ভাগ নাটক হচ্ছে ঐতিহাসিক, প্রায় ৭০ ভাগ সামাজিক, প্রায় ৪ ভাগ লোক কাহিনীভিত্তিক এবং প্রায় ৪ ভাগ্য অন্যান্য বিষয় নিয়ে রচিত। স্বাধীনতা-পূর্ব কালের সঙ্গে তুলনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে শতকরা অনুপাতটা ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের মধ্যে ওলট পালট হয়ে গেছে। স্বাধীনতা-পূর্বকালের ঐতিহাসিক নাটকের অনুপাতটা স্বাধীনতা-উত্তর কালে সামাজিক নাটকের ভাগে পড়েছে।

এবার উপরোক্ত ২৭৮ জন নাট্যকারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় খ্যাতিমানদের একটা সংক্ষিপ্ত খতিয়ান নীচে দেওয়া হলঃ

www.pathagar.com

নাট্যকারের নাম (নামের আদ্যাক্ষরের ক্রম অনুসারে)	জন্ম সাল	প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা
অন্নদা মোহন বাগচী	—	১০
আনিস চৌধুরী	১৯২৯	২
আবদুল হক	১৯২০	৯ (৭টি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ)
আবুল ফজল	১৯০৩	৪
আজিম উদ্দিন আহমদ	১৯০৪	৪
আলাউদ্দিন আল-আজাদ	১৯৩২	৩
আলি মনসুর	—	৪
আসকার ইবনে শাইখ	১৯২৫	১৭ (১টি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ)
ইব্রাহীম খলীল	১৯১৭	৪
ইব্রাহীম খাঁ	১৮৯৪	৩
ওবায়েদ-উল-হক	১৯১২	৭
কবীর চৌধুরী	১৯২৩	৮ (সবকটিই ইংরেজি নাটকের অনুবাদ)
কল্যাণ মিত্র	১৯৩৯	১৪
গোলাম রহমান, এম.	—	১০
কবি জসীমুদ্দিন	১৯০৪	৫
নূরুল মোমেন	১৯০৮	৭
প্রসাদ বিশ্বাস	—	৯
বজলুর রশীদ, আ. ন. ম.	১৯১১	৮
মুনীর চৌধুরী	১৯২৫	৭ (২টি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ)
শওকত ওসমান	১৯১৯	১০ (৫টি ইংরেজি নাটকের অনুবাদ)

এখানে আবার উল্লেখ করছি যে উনিশ শ' সাতচল্লিশের স্বাধীনতার সময় পূর্ববাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তান নামের এই জনপদে বলতে গেলে তেমন কোন বিশিষ্ট নাট্য-ঐতিহ্য ছিল না। "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাই দেখা গেল আমাদের কোন রঙ্গমঞ্চ নেই, নেই পেশাদার বা সৌখিন কোন নাট্য-সম্প্রদায়। শক্তিশালী নাট্যকার, পরিচালক বা অভিনেতা স্বভাবতঃই দুর্লভ। আছে

www.pathagar.com

নাটকের প্রতি সন্দিগ্ধ রক্ষণশীল সমাজ, জীবনের সঙ্গে যোগবিহীন কিছু নাটক, মান্ধাতার আমলের মঞ্চ সজ্জা, দৃশ্যপট ও আলোক ব্যবস্থা। শুরুতে যে অবস্থা দেখা গেল তার সঙ্গে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের মঞ্চ ও অভিনয়ের তুলনা করলে দেখা যায়, পূর্ব-পাকিস্তানে নাটক ও অভিনয় তখনও গিরিশ যুগের পেছনে।" (পূর্ব-প্যাকিস্তানের নাট্য আন্দোলনের বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাস ঃ ঢাকা মঞ্চ, রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক সংবাদ পত্রিকা সংযোগ, ১৯৬৫, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩)।

১৯৫০ সাল সেদিনের 'পূর্ব-পাকিস্তান'-এর নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্মরণীয় এজন্য যে ঢাকার 'ডক্টর্স ক্লাব'-এর উদ্যোগে মেহবুব আলী ইনষ্টিটিউটে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজয়া' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ওই সালের শেষের দিকে। তাতে সহ-অভিনয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়। এতে অংশ গ্রহণ করেন মিসেস সারওয়ার মোর্শেদ, ডাঃ মেহেরুন্নেসা, রাজিয়া খান, মুনীর চৌধুরী, ডাঃ শামসুল আজম প্রমুখ শিক্ষিত সংস্কৃতিবান ব্যক্তিবর্গ। পরিচালনা করেন হাবিবুল হক। মরহুম হাবিবুল হকের নাম আমাদের নাট্যান্দোলনের ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে থাকবার মত একটি নাম। কেবল 'বিজয়া' নয়, সাতচল্লিশোত্তর কালের প্রথম দিকটায় সহ-অভিনয় সমৃদ্ধ আরও দু'টি নাটক—হাবিব প্রডাকশন কর্তৃক বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মেঘমুক্তি' ও সংস্কৃতি সংসদ নিবেদিত বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'—জনাব হাবিবুল হকের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। ওই সময়ে মেডিক্যাল কলেজের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' ও সাংবাদিক ইউনিয়নের 'নীলদর্পণ'-এও সহ-অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-অভিনয়ের ব্যাপারে বিধি-নিষেধ ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা 'সংস্কৃতি সংসদে'র মাধ্যমে সহ-অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে 'জবানবন্দী' মঞ্চস্থ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে মেহবুব আলী ইনষ্টিটিউটে। পরে চট্টগ্রামের 'প্রান্তিক শিল্পী গোষ্ঠী'ও 'জবানবন্দী' মঞ্চস্থ করেন এবং সম্ভবত তাতেই সেখানে প্রথমবারের মত প্রচলিত হয় সহ-অভিনয়।

"পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্যান্দোলনের প্রথম পর্যায়ের ইতিহাসে আরও কয়েকটি স্মরণীয় পরিবেশনা হল 'ছেঁড়া তার', 'ষোড়শী', 'নার্সিং হোম' এবং 'পথিক'। 'ছেঁড়া তার'-এর উদ্যোক্তা ছিলেন সুরশিল্পী আববাস-উদ্দিন। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীও যুক্ত ছিলেন এর সঙ্গে। 'নার্সিং হোম' নাটকের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক ছিল শরফুল আলমের মঞ্চ পরিকল্পনা। শরফুল আলম প্রথম আমাদের গতানুগতিক মঞ্চসজ্জার মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়নে

www.pathagar.com

সচেষ্ট হন। 'পথিক' নাটক সংস্কৃতি সংসদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪)।

আমাদের নাট্যান্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনয় প্রয়াসকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যদিও সেখানে তখন কোন সংগঠিত নাট্যগোষ্ঠী ছিল না, তবুও বিভিন্ন ছাত্রাবাস, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়নি) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা তাদের নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্য প্রশিক্ষণ ও নাট্যান্দোলনের ধারাকে বেগবতী করে তাকে অব্যাহত রেখেছেন। আর সেই ধারাই ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হয়েছে সারা দেশে। আবার অধ্যাপক ডক্টর রফিকুল ইসলামের কথায়, "স্মরণীয় যে প্রথম যুগের ডক্টরস ক্লাব বা সংস্কৃতি সংসদ এবং পরবর্তীকালের নাট্যগোষ্ঠী 'ড্রামা সার্কেল', বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিক্যাল কলেজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। ১৯৫৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'কবয়ঃ' এবং 'মেঘনাদ বধ কাব্য' অংশ বিশেষের নাট্য রূপায়ণ, সলিমল্লাহ মুসলিম হলের 'কেরানীর জীবন' নাটক কেবল আনুষ্ঠানিক সহ-অভিনয়ের অনুমতি লাভের জনাই নয়—সুষ্ঠু পরিবেশনার জন্যেও উল্লেখযোগ্য। মুনীর চৌধুরী কৃত শ'-এর 'ইউ নেভার ক্যান টেল'-এর রূপান্তর 'কেউ কিছু বলতে পারে না'র সার্থক মঞ্চ রূপায়ণ এবং বিজ্ঞান সম্মেলনে অভিনীত হ য ব র ল' পরিবেশিত গীতিনাট্য 'তাসের দেশ' ১৯৫৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্মরণীয় অভিনয়। ১৯৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন কার্জন হলে সপ্তাহব্যাপী নাট্য উৎসবের আয়োজন করে। পর পর সাত রাত ধরে অভিনয়ই এ নাট্য উৎসবের মূল কথা নয়। এ উৎসবে নতুন কিছু করবার চেষ্টা ছিল। বনফুলের 'কবয়ঃ', আনিস চৌধুরীর 'মানচিত্র', মুনীর চৌধুরী রূপান্তরিত 'কেউ কিছু বলতে পারে না' মঞ্চস্থ করতে গিয়ে গতানুগতিক মঞ্চ, দৃশ্য ও আলোক সজ্জার পরিবর্তে এসেছে নতুন পরিকল্পনা, আধুনিক ব্যবস্থাপনা। এ বছরের আর একটি পরীক্ষা-মূলক পরিবেশনা ২১শে ফেব্রুয়ারীর পটভূমিকায় রচিত মুনীর চৌধুরীর 'কবর'। পরের বছর সিপাহী বিদ্রোহের শত বার্ষিকী উপলক্ষে আসকার ইবনে শাইখের 'অগ্নিগিরি' নাটক ঐতিহাসিক নাটকের ঐতিহ্যকে জাগ্রত করে তোলে আমাদের সামনে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যান্দোলনের পেছনে যে কয়েকজন অধ্যাপকের অপরিসীন দান রয়েছে তাঁরা হলেন—নূরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী আসকার ইবনে শাইখ। এই তিন জন প্রখ্যাত নাট্যকারকে কেন্দ্র করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনয় প্রচেষ্টা রূপ লাভ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধকারের সৌভাগ্য হয়েছে

www.pathagar.com

উল্লিখিত ত্রয়ীর সহায়করূপে বা অভিনেতারূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে পঞ্চাশ সাল থেকে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত থাকবার।" (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫)।

এবার প্রীতিভাজন অধ্যাপক-সহকর্মী ডক্টর রফিকুল ইসলামের প্রবন্ধ থেকে এক সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি। "পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্যান্দোলনের প্রগতি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বাংলা একাডেমী আয়োজিত 'নাট্য মৌসুম' বা অন্য কোন উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

নাটকের উৎকর্ষে গোষ্ঠীগত সাধনার প্রয়োজন খুব বেশী। কারণ, নাটক একটি সমবায় প্রয়াস। আমাদের এখানে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বা পেশাদার থিয়েটারের অভাব হেতু এমন সম্প্রদায়ের প্রয়োজন আরও অধিক, যে গোষ্ঠীতে নাট্যকার থাকবেন, থাকবেন প্রয়োগকর্তা, সঙ্গীত পরিচালক শিল্প নির্দেশক, মঞ্চ ব্যবস্থাপিক, অভিনেতা, অভিনেত্রী আর সবাই মিলে কাজ করবেন ভালো নাটক করার জন্যে। সে রকম গোষ্ঠী গঠনের প্রথম প্রচেষ্টা বোধ করি 'ড্রামা সার্কেল'। বর্তমানে ঢাকায় আরো অনেকগুলো নাট্য সম্প্রদায় রয়েছে। নাট্য নিকেতন, সাতরং নাট্যগোষ্ঠী, রঙ্গম, বুলবুল একাডেমী নাটক বিভাগ, সমকাল কলা পরিষদ, কৃষ্টি সংঘ, নীতা থিয়েটার্স, মিনার্ভা থিয়েটার্স প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত নাট্য অনুশীলন প্রয়াস 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী'। নিম্নোক্ত তালিকা থেকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নাট্য প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা উচিত যে, এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়। তাই কোন গোষ্ঠীর নাম বা উল্লেখযোগ্য অভিনয় বাদ যেতে পারে। তাই আগেই সংশ্লিষ্টদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বলা বাহুল্য যে, এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে দায়ী পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব।

ড্রামা সার্কেল

কবয় ঃ বনফুল
কেউ কিছু বলতে পারে না ঃ রূপান্তর—মুনীর চৌধুরী
মানচিত্র ঃ আনিস চৌধুরী ঃ মাকসুদুস সালেহীন পরিচালিত
রক্ত করবী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ ঐ
অল মাই সন্স ঃ রূপান্তর—বজলুল করিম ও মাহমুদ হাসান ঃ মুনীর চৌধুরী পরিচালিত

রাজা ও রাণী ঃ রবীন্দ্রনাথ
তাসের দেশ ঃ রবীন্দ্রনাথ

www.pathagar.com

ইডিপাস ঃ রূপান্তর–সৈয়দ আলী আহসান ঃ বজলুল করিম পরিচালিত
কালবেলা ঃ সাঈদ আহমেদ ঃ ঐ
আর্মস এন্ড দি ম্যান ঃ রূপান্তর ও পরিচালনা–বজলুল করিম
সপ্ত সূরের থীবি আক্রমণ ঃ ঐ ঐ

সাতরং নাট্যগোষ্ঠী

রক্তপদ্ম ঃ রচনা ও পরিচালনা—আসকার ইবনে শাইখ
প্রচ্ছদপট ঃ আসকার ইবনে শাইখ ঃ পরিচালনা–ফখরুজ্জামান চৌধুরী ও জিয়া হায়দার
মাইল পোষ্ট ঃ সাঈদ আহমেদ ঃ পরিচালনা–আসকার ইবনে শাইখ
অনেক তারার হাতছানি ঃ রচনা ও পরিচালনা–আসকার ইবনে শাইখ
অগ্নিগিরি ঃ রচনা ও পরিচালনা—আসকার ইবনে শাইখ
মায়াবী প্রহর ঃ আলাউদ্দিন আল আজাদ ঃ পরিচালনা—আসকার ইবনে শাইখ

রঙ্গম

চরিত্রহীন ঃ শরৎচন্দ্র ঃ নাট্যরূপ ও পরিচালনা—নীলিমা ইব্রাহীম
দুয়ে দুয়ে চার ঃ নীলিমা ইব্রাহীম ঃ পরিচালনা–রনেন কুশারী
কংকাল ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ নাট্যরূপ ও পরিচালনা—নীলিমা ইব্রাহীম
নব মেঘদূত ঃ নীলিমা ইব্রাহীম ঃ পরিচালনা—রনেন কুশারী

নাট্য নিকেতন

ফেরদৌসী ঃ আবদুল হক ঃ পরিচালনা—আবদুন নূর
বহিপীর ঃ সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ ঃ পরিচালনা–শৌভনিক

বুলবুল একাডেমী

মনোনীতা ঃ রচনা ও পরিচালনা–নীলিমা ইব্রাহীম
আলোছায়া ঃ ,, —নূরুল মোমেন
ডাকঘর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ পরিচালনা—আমিনুল হক

সমকাল কলা পরিষদ

শকুন্ত উপাখ্যান ঃ সিকান্দার আবু জাফর ঃ পরিচালনা–ইসমাইল মোহাম্মদ
সিরাজ-উদ্দৌলা ঃ ঐ ঐ ঐ

www.pathagar.com

কৃষ্টি সংঘ

আমীর আকরাম ঃ রচনা ও পরিচালনা—আলী মনসুর

নীতা থিয়েটার্স

প্রত্যাগত ঃ আবদুর রহিম আখন্দ ঃ পরিচালনা—নুরুল আনাম খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী

ক্রীতদাসের হাসি ঃ শওকত ওসমান ঃ নাট্যরূপ ঃ রামেন্দ্র মজুমদার ঃ পরিচালনা—নজমুল হুদা

দণ্ড ও দণ্ডধর ঃ মুনীর চৌধুরী ঃ পরিচালনা—রফিকুল ইসলাম

কৃষ্ণকুমারী ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ পরিচালনা—রফিকুল ইসলাম

ভ্রান্তিবিলাস ঃ সেক্স্‌পিয়ার ঃ গদ্য অনুবাদ—বিদ্যাসাগর ঃ নাট্যরূপ—রামেন্দু মজুমদার ঃ পরিচালনা—রফিকুল ইসলাম

১৯৬১-৬২ সালের প্রথম নাট্য মওসুমে মঞ্চস্থ নাটক

(বাংলা একাডেমীর ড্রামা সিজন কমিটি আয়োজিত)

রক্তপদ্ম ঃ আসকার ইবনে শাইখ ঃ পরিবেশনায়—সাতরাং নাট্যগোষ্ঠী

নৌফেল ও হাতেম ঃ ফররুখ আহমেদ ঃ পরিবেশনায়—রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা

ইডিপাস ঃ সৈয়দ আলী আহসান ঃ পরিবেশনায়—ড্রামা সার্কেল

শকুন্ত উপাখ্যান ঃ সিকান্দার আবু জাফর ঃ পরিবেশনায়—সমকাল কলা পরিষদ

রক্তাক্ত প্রান্তর ঃ মুনীর চৌধুরী ঃ পরিবেশনায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

১৯৬২-৬৩ সালের দ্বিতীয় নাট্য মওসুমে মঞ্চস্থ নাটক

ফেরদৌসী ঃ আবদুল হক ঃ নাট্য নিকেতন

প্রচ্ছদপট ঃ আসকার ইবনে শাইখ ঃ সাতরং নাট্যগোষ্ঠী

আর্মস এণ্ড দি ম্যান (বাংলা অনুবাদ) ঃ বার্নার্ড শ' ঃ ড্রামা সার্কেল

সিরাজ উদ্দৌলা ঃ সিকান্দার আবু জাফর ঃ সমকাল কলা পরিচ্ছদ

www.pathagar.com

১০৬৩-৬৪ সালের তৃতীয় নাট্য মওসুমে মঞ্চস্থ নাটক

বহিপীর ঃ সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ্ ঃ নাট্য নিকেতন
কৃষ্ণকুমারী ঃ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী
ভ্রান্তিবিলাস ঃ সেক্স্পিয়ার ঃ ,,
অনেক তারার হাতছানি ঃ আসকার ইবনে শাইখ : সাতরং নাট্যগোষ্ঠী

পঞ্চাশের দশক থেকে আরম্ভ করে ষাটের দশক পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদের উদ্যোগে যেসব নাট্যানুষ্ঠান আয়োজিত হয়, তাতে অংশগ্রহণকারী যেসব কৃতী ছাত্রছাত্রীদের (সে সময়ে) নাম মনে পড়ছে তাঁরা হচ্ছেন ঃ সর্বজনাব অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, মুজিবুর রহমান খান (সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক), ওবায়দুল হক সরকার (অভিনেতা ও বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-পরিচালক), নূরুস সোবহান, সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান (মরহুম) আবুল খায়ের মোহি-ব্বুর রহমান (অভিনেতা), রোকেয়া কবির, হোসনে আরা (বিজু), সাবেরা খাতুন, মনিমুন্নেসা, জহরত আরা, লিলি চৌধুরী, মমতাজ লিলি খান, নূরুন্নাহার, মাকসুদুস্ সালেহীন (মরহুম), অজয় কুমার রায় (ডক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক), রফিকুল ইসলাম (ডক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), রাজিয়া খান আমিন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), মাসুদা খাতুন, ফরিদা বারি মালিক, কামরুন নাহার লায়লী (মরহুমা এডভোকেট) সৈয়দা রওশনারা (অধ্যাপিকা), জাহানারা লাইজু, এম. আনোয়ার হোসেন (বর্তমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর-জেনারেল), মওদুদ আহমেদ (বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী), ফখরুল ইসলাম (বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার), সিরাজুল আলম খান (প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা), শহীদ খান, ইকবাল আনসারি খান, সাখাওয়াত হোসেন, মমতাজউদ্দিন আহমদ (নাট্যকার-অভিনেতা ও সরকারী কলেজের অধ্যাপক), তৌফিক আজিজ খান (প্রখ্যাত ক্রীড়া-ভাষ্যকার), নজমুল হুদা বাচ্চু (অভিনেতা), সৈয়দ আহসান আলী সিউনী (অভিনেতা), দীন মুহাম্মদ খান (ব্যাংকার), আবদুল্লাহ্ আল-মামুন (প্রখ্যাত নাট্যকার-অভিনেতা-চিত্র পরিচালক ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অন্যতম কর্মকর্তা), মুসা আহমেদ (বাংলাদেশ টেলিভিশনের অন্যতম কর্মকর্তা), আতাউর রহমান বর্তমানে প্রখ্যাত অভিনেতা-পরিচালক), এনায়েত পীর খান (এডভোকেট), এনামুল হক চৌধুরী (বর্তমানে রেডিও বাংলাদেশে অন্যতম আঞ্চলিক পরিচালক), ফেরদৌসী মজুমদার (প্রখ্যাত অভিনেত্রী),

www.pathagar.com

রামেন্দু মজুমদার (নাট্য-সংস্থার সংগঠক ও অভিনেতা), খন্দকার শওকত আলী (বর্তমানে প্রখ্যাত ডাক্তার), কেরামত মাওলা (প্রখ্যাত অভিনেতা ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অন্যতম ডিজাইনার) বজলুল করিম (মরহুম অভিনেতা-পরিচালক), তৌফিক হোসেন (এডভোকেট), মির্জা এ. রশীদ (ব্যাংকের উচ্চপদস্থ অফিসার), জিয়া হায়দার (নাট্যকার ও বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), আবিদ হোসেন (মরহুম), মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম (রংপুর সরকারী কলেজের অধ্যাপক), আশরাফ উদ্দিন আহমদ (বর্তমানে 'উজ্জল' নামে চিত্র-তারকা), প্রদীপ কুমার দে (বর্তমানে চলচ্চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক), আফতাব উদ্দিন আহমেদ (বর্তমানে ডক্টর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক), সাঈদ তারেক (নাট্যকার-অভিনেতা), নুরুল আলম তালুকদার, নরেশ ভূঁইয়া, প্রদীপ কুমার সাহা, লক্ষ্মীকান্ত দত্ত, এস. এম. কাউসার (এডভোকেট), হাবিবুর রহমান (এডভোকেট), রুহুল কাদের চৌধুরী (এডভোকেট), এম. এ. কুদ্দুস (এডভোকেট), এম. জাহাঙ্গীর (এডভোকেট), এ. ওয়াহাব (এডভোকেট), জিয়াউদ্দিন (এডভোকেট), এম. এ. বকর (এডভোকেট), এস. এম. হোসেন (এডভোকেট), এম. ইদ্রিস (এডভোকেট), এম. আবদুল্লাহ্ (এডভোকেট) এবং আরও অনেকে যাঁদের নাম এখন আর মনে পড়ছে না। উপরোক্ত কৃতিবিদদের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগের সঙ্গেই আমি নাট্য-প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। অভিনয়-শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে নাট্য-পরিচালনা ও নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাসহ সকল কাজেই কমবেশি সবার সঙ্গেই আমি ছিলাম ঘনিষ্ঠ নাট্যকর্মী। বেশ কিছু সংখ্যক কৃতিমানের সঙ্গে সে-সম্পর্ক আজও বিদ্যমান।

এমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে নাট্যকর্মে সংশ্লিষ্ট থেকেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বেশ কিছু সংখ্যক নাট্য-প্রয়াসীর সঙ্গেও। তাঁদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন ঃ অভিনেতা মরহুম নুরুল আনাম খান, এবং সর্বজনাব আমিনুল হক (অভিনেতা) আবদুল মতিন (অভিনেতা), সৈয়দ মেয়াজ্জম হোসেন (রেডিও বাংলাদেশের নাট্য-পরিচালক ও অভিনেতা), শওকত আকবর (প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-অভিনেতা), মামুনুর রশীদ (নাট্যকার ও অভিনেতা-পরিচালক), অভিনেত্রী গীতা দত্ত, শিশু মুখার্জী ও আবদুস সালাম (মঞ্চসজ্জাকর) এবং সুরেশ দত্ত (রূপসজ্জাকর)।

জনাব আসিরুদ্দীন আহমদ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পেশাদার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসেন ১৯৫৭ সালে। অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন 'মিনার্ভা থিয়েটারস'। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মিনার্ভা

www.pathagar.com

থিয়েটারসের জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। তারপরই তাতে আসে ভাটার টান। কিছুটা অনিয়মিতভাবে তা চলে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত।

'মিনার্ভা থিয়েটারসে'র ফাইল-পত্র, শিল্পীদের কন্ট্রাক্ট-পত্র সবকিছুই জনাব আসিরুদ্দীনের কাছে আজও সুরক্ষিত। সেসব থেকে দেখা যায়ঃ ১৯৫৯ সালে 'মিনার্ভা থিয়েটারস'-এ অংশ গ্রহণ করেছেন সর্বজনাব আনোয়ার হোসেন, আমজাদ হোসেন, সৈয়দ হাসান ইমাম, আহসানুর রহমান ভূঁইয়া, মিসবাহ উদ্দিন. সাইফুদ্দিন, আখতার হোসেন, কাজী মেহফুজুল হক, আনোয়ারা, রাণী সরকার, আফরোজ হাসনাইন, ফওজিয়া ইয়াসমিন, নাজমা ইয়াসমিন, ইসমাইল তালুকদার, সোনা মিয়া, মাসুদ খান (রাজ আহমদ), জহীর চৌধুরী, মনতোষ দেব, মীর আলতাব আলী, মাহবুবুর রহমান, শচীন কুমার চাকী, আল-ইমাম, এম. এ. খালেক, ভগবতী চক্রবর্তী, রেণুকা চক্রবর্তী, নূরুল ইসলাম, শাহীন ইসলাম, ফরহাদ খলীল, শরীফ হোসেন, আবদুর রশীদ, দেবেন্দ্র ভৌমিক, গোলাম কিবরিয়া, সাইফুল আলম, আজমল হোসেন খান, আবদুর রহমান, আবদুস সোবহান (আশু বাবু), আকরাম মালিক. জাহাঙ্গীর হোসেন, খন্দকার সিরাজুল ইসলাম, সৈয়দ শা'জাহান প্রভৃতি।

১৯৬০ সালের কন্ট্রাক্ট-ফরম অনুযায়ী 'মিনার্ভা থিয়েটারস'-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন সর্বজনাব সিরাজুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর কবির, নেজামত উল্লাহ্, নারায়ণ চক্রবর্তী, মনজুর হোসেন, আহমাদুর রহমান (রানু), সৈয়দ হাসান ইমাম, জরীনা, তন্দ্রা ভট্টাচার্য, মিনতি হোসেন, চিত্রা সিন্‌হা, ফতেহ্ লোহানী, শামসুদ্দোহা, মিস পিনু, মিস আবেশ, প্রণয় কুমার, বরুণ কান্তি, গোলাম রফিক, ননী দাস, হুমায়ুন, বুলবুল ইসলাম, গীতা দত্ত, স্বপ্না, মুহাম্মদ আনিস, পূর্ণিমা সেনগুপ্তা, মুক্তা, আন্না, ডাঃ এন. এন. সিদ্দিকী, সুভাষ দত্ত, নাসিমা খান, ফজলুর রহমান, বিনয় বিশ্বাস, নাজনীন, মঞ্জুশ্রী বিশ্বাস, গোলাম কবীর, দেলোয়ার হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম, শেখ আবদুল মান্নান, ফিরোজা খন্দকার, আলেয়া খন্দকার, শেখ গোলাম মোস্তফা ও মণি। 'মিনার্ভ থিয়েটার্স্'-এর মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জনাব আবদুল গফুর সারথী এবং নির্দেশনায় জনাব আসিরুদ্দীন আহমদ, মুহাম্মদ আনিস এবং অন্যান্যরা। এখানে উল্লেখ্য যে এই পেশাদার থিয়েটারে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই আজ সিনেমা শিল্পের নানা দিকে সুপরিচিত। পারফরমেন্স অনুযায়ী প্রতি রাত্রিতে শো'র জন্য তাঁরা পেতেন ১৫ টাকা, ১০ টাকা ও ৫ টাকা করে। টিকেটের হার ছিল ৫ টাকা, ৩ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা ও আট আনা।

www.pathagar.com

উল্লিখিত তথ্য-তালিকা প্রমাণ করবে, সাতচল্লিশোত্তর কালে আমাদের নাটক রচনার উৎসাহ-উদ্দীপনা সাতচল্লিশ-পূর্ব কালের তুলনায় বেড়েছে অনেক। সাতচল্লিশের দুই পারের নাট্য-অভিজ্ঞতার দুইকালের পরিমাণও প্রায় সমান বলে এই তুলনা বৈধ। কিন্তু নাটক আমাদের উৎকর্ষমানের হয়নি। শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিন্সি তাঁর রাজার এক যুদ্ধের প্রয়োজনে একটি নদীর গতিপথকে সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত করবার জন্য যথাবিহিত খাল কাটালেন। যুদ্ধ হল, জয়-পরাজয়ও হল। কিন্তু নূতন পথে নদী প্রবাহিত হল না। নাট্যধারার পরিবর্তনও হঠাৎ হয় না। অবিশ্যি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে অতি অল্প সময়ে সে পরিবর্তন আনা অসম্ভব না-ও হতে পারে। গত কয়েক বছরে এখানকার পরিবেশ পরিবর্তিত হলেও তা উপযুক্ত ছিল, একথা বলা যায় না। এতদিন আমরা যেসব নাটক লিখেছি, সাধারণ ভাবে দেহ-ব্যবচ্ছেদ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশেরই আঙ্গিক, অভিনয় ও মঞ্চ-রীতি পুরনো ও চিরাচরিত। সেগুলোর কাহিনী, চরিত্র-চিত্রণ, সংলাপ ও দৃশ্য-পরিকল্পনা আমাদের লব্ধ নাট্য-অভিজ্ঞতারই ছাপ বহন করে। দেশে সমাজে অত্যাচার-অবিচার চলছে। ঘুষখোর, মুনাফাখোর, মামলা-বাজ, ফতোয়া-বাজ নিরাপরাধের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। তরুণ নায়ক এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত। একটি ষোড়শী প্রেম তাকে উৎসাহ যোগায়। অনেক কষ্টের পর সে জয়ী হয়। কোন ক্ষেত্রে ষোড়শী গৃহিণী হয়, কোন ক্ষেত্রে হয় না। এই হল মোটামুটি নাটকের কাঠামো। কাহিনীর কাল দীর্ঘ। স্থান একাধিক। নাটক কতিপয় অঙ্কে এবং প্রতি অঙ্ক কতিপয় দৃশ্যে বিভক্ত। সমগ্র নাটক যেন সংলাপে ব্যক্ত পুরনো আঙ্গিকের এক বাংলা উপন্যাস। আমাদের রচিত সামাজিক বেশির ভাগ নাটকের মোটা-মুটি এই পরিচয়। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কিন্তু সে ব্যতিক্রমও নিয়ম-স্থাপনের মত জোরদার নয়। যাত্রা ও ঐতিহাসিক নাটকের আঙ্গিকও মোটা-মুটি তা-ই। পার্থক্য যা, তা অনেকাংশে কাহিনী-উৎসের পার্থক্যের জন্য। বলা যায়, যাত্রার আঙ্গিকই দেশ-কালের পরিবর্তনে গা' মুড়ে ঐতিহাসিক নাটক হয়ে বর্তমানের সামাজিক নাটকে এসেছে। কাহিনী-উৎসের পরিবর্তন অর্থাৎ পৌরাণিক থেকে ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক থেকে সামাজিক নাটক-রচনার ধারাবাহিকতা যুগ-পরিবর্তনের ফল। এই পরিবর্তন ঠিকই এসেছে। আসেনি আঙ্গিকের পরিবর্তন। মনে রাখতে হবে, এখানকার নাট্য-পিপাসুদের চাহিদারও এমন কোন পরিবর্তন হয়নি যাতে আঙ্গিক-পরিবর্তনের খুব জোর তাগিদ আসতে পারে। চাহিদার সঙ্গে সরবরাহের সম্পর্ক খুব প্রত্যক্ষ। সাধারণ নাটকেই আমাদের চলে এসেছে এতদিন। এতেই সমাজের মনোরঞ্জন হয়ে এসেছে। নূতন ভাবধারা ও জাতীয়তার আবেগ-প্রকাশের ইচ্ছা থেকেও

www.pathagar.com

আমাদের বহু নাটকের জন্ম। আবার এত নাটক 'বহু'র ভাবধারা ও আবেগকে বাড়িয়ে দিতেও কম সাহায্য করেনি। এদিক থেকে ওসব নাটকের প্রয়োজন ছিল বৈকি! এবং এই সাধারণ নাটকের পক্ষে এ প্রয়োজন মেটানোর গৌরবও যথেষ্ট। Poetic justice-এর প্রতি আমাদের প্রকৃতিগত যে একটা সাধারণ টান আছে, সেই টানই এসব নাটক দ্বারা কিছুটা শান্ত হয়। কারণ এ জাতীয় নাটকে ধর্ম, সত্য, ন্যায়, মহত্ব প্রভৃতি জীবন-ধারণা যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রচারিত হয়ে থাকে, অথচ কিছুতেই সেই অন্যায়ের উপশম হয় না—তারই পরাজয় বা ধিক্কারে আমরা আত্মপ্রসাদ পাই। মোহিতলাল বলেছেন ঃ

> "এই সাধারণ নাটক যে সর্বকালীন বা সার্বভৌমিক সাহিত্য-সৃষ্টি নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাতে সময় বিশেষে সমাজ বিশেষের মনোরঞ্জন হইয়া থাকে, সেই প্রত্যক্ষ ফললাভই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তথাপি সেইরূপ নাটকেও যে ভাবোদ্দীপনা থাকে, তাহাতেই এক ধরনের রসোদ্রেক হয়। -সাধারণ নাটকে ঐ ভাবোদ্দীপনা নিম্নস্তরেই থাকিয়া যায়, চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দেয় না, ধাক্কা দেয়—একটা উত্তেজনা প্রসূত নেশার সৃষ্টি করে মাত্র। তথাপি সেই নেশারও দাম আছে। মানুষের নিতান্ত বাস্তবপীড়িত মন উহাতেই কিছুক্ষণের জন্য বাস্তব-মুক্তির একটা সুখ অনুভব করে; বাস্তবকে খুব গভীররূপে রূপান্তরিত করিবারও প্রয়োজন হয় না, কেবল তাহাকে জীবনের মঞ্চ হইতে রঙ্গমঞ্চে তুলিয়া অভিনয়ের দ্বারা একটু শোধন করিয়া লইলেই হইল।"

রাষ্ট্রীয় ও যুগ-পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন ও মননের পরিবর্তন হয়। কিন্তু তা রাতারাতি হয় না। কিছুটা সময় লাগে। তাছাড়া ধাতস্থ হয়ে সে পরিবর্তন শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে নূতনরূপে প্রকাশিত হতেও সময় লাগে। বিশ-পঁচিশ বছর তার জন্য খুব যথেষ্ট নয়। অন্তত আমাদের ক্ষেত্রে তা-ই প্রমাণিত হয়েছে। এখনও অতীতের নাট্য-অভিজ্ঞতা আমাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছে—চাহিদাতেও, সরবরাহেও।

কিন্তু পরিবর্তন এসেছিল। সাতচল্লিশের সাধীনতা ছাড়াও। সে পরিবর্তন জীবনযাত্রার, দৃষ্টিভঙ্গির। নাটক কি ধরনের হবে, তা জেনেই তার অভিনয় দেখতে যাই। কিন্তু তৃপ্তি পাই না। অথচ এ ধরনের নাট্যাভিনয়ে কিছু-দিন আগেও তুষ্টি ও চাঞ্চল্য ছড়ানো ছিল। আমরাই তা কুড়িয়েছি। এ কি অস্বীকার করা যাবে যে, এই আনন্দ-বঞ্চনার দায়িত্ব অনেকটা আমাদেরই মনের? মনেরই পরিবর্তন হচ্ছে। এটা যুগ পরিবর্তনের ফল। রুশ-মার্কিন শিল্প-জ্ঞানে চাঁদের মুখ ঘুরে বেড়ালেও সেদিন পর্যন্ত

www.pathagar.com

আমরা অনেকেই বাস্তব জেট বিমান চোখে দেখি নি। কাজেই ওসব দেশে শিল্প যুগ বুড়িয়ে গেলেও আমাদের দেশে তা নবজাত। শিল্প যুগ স্বাভাবিকভাবেই এদেশেরও জীবন-যাত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনবে। নবজাতের বয়স একটু বাড়লেই তা আশা করা যায়। নতুন যুগের সমস্যায়-সমাধানে তখন মানুষ জীবনকে অনুভব করবে নতুন করে। নাট্যকার এই অনুভূত জীবনকেই তুলে ধরবেন নতুন আঙ্গিকে। এই পরিবর্তনের কারণ ও ফল কিছুটা সময়ের দুই পারে অবস্থিত। আমাদের এখানে পরিবর্তনের কারণ ঘটেছে এবং ঘটছে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীন জীবনের মধ্যযুগীয় আরাম-আয়েশ, চলা-বলা, আনন্দ-উৎসব বর্তমান যুগের শহর-জীবনে তো কল্পনা করাই যায় না। গ্রামীণ জীবনেও আজ তা বেমানান। সারারাত জেগে থেকে যাত্রাগানের লীলা-মাধুর্য উপভোগ করতে গাঁয়ের চাষীও আজ নারাজ। সে জানে, রাতের পরের দিনটি তাকে ক্ষেতে কাটাতে হবে। রাতের ঘুম তার সহায়ক। তাছাড়া যাত্রার আসর বসায় কে? আগে ছিল রাজা-রাজড়া, জমিদার-তালুকদার। তাঁদের মিহি জীবনের দ্যুতির বিচ্ছুরণ হিসাবে জনসাধারণ পেত যাত্রা-থিয়েটার, নাচ-গানের আনন্দ। কিছুদিন আগেই তাঁরা অতীত হয়েছেন এবং যাঁরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত, তাঁরা আজও ব্যাংকের ব্যস্ত পথে ধুলি উড়াচ্ছেন। মনের আনন্দ-বাসনার গলি-পথে নজর দিলেও সংস্কৃতির ছায়াপথে দৃষ্টি ফেরানোর প্রবৃত্তি লাভ করতে তাঁরা এখনও পারেন নি। গাঁয়ের লোকেরা মাঝে মাঝে তাঁদের লাখ-বিলাখের খবর পায়। কিন্তু ক্ষয়ে যাওয়া অতীতের আস্বাদন আর পায় না। কাজেই মধ্যযুগীয় আনন্দ-ধারার তলানিটুকুতে গা' ভিজিয়ে অবগাহনের আস্বাদ পেতে চেষ্টা করে এদেশের শতকরা নব্বই জন। বাকী দশ জন—অশিক্ষিত শ্রমিক থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম শিক্ষা ও সম্মানলব্ধ সংস্কৃতিবান—যাঁরা শহরে বসবাস করছেন, তাঁরা পরিবর্তনের বিভিন্ন স্রোতে ভাসমান। বিভিন্ন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন তাঁদের দাবীর প্রকৃতি ও মান। তাঁদেরই মধ্যেকার শিল্পীরা দিশাহারা না হলেও চকিতদৃষ্টি। হয়তো কিছুটা হতচকিত। আজকের দুনিয়া থেকে সাধ তারা যত পেয়েছেন, এই অল্প সময়ে সাধ্য তত পান নি। ফলে, তাঁদের সৃষ্টি শিল্পপিপাসুর মনকে অতৃপ্তির বিরক্তিতে চঞ্চল করে তোলে। যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এ স্বাভাবিক। এখন এখানে শিল্প যুগের আরম্ভ। পরিণতি আসার সময় আরও পরে।

কিন্তু আমরা এই নতুন দিনকে গ্রহণ করতে কতটা তৈরি হচ্ছি, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। নাট্যান্দোলনে এ প্রস্তুতির লক্ষণ যদি থাকে, তার

www.pathagar.com

প্রমাণ মিলবে নাট্যকর্মীর বিভিন্ন প্রচেষ্টায়। নাটক রচনায় ও প্রযোজনায় নতুন আঙ্গিক আবিস্কারের অভিলাষ যদি আমরা এ অবস্থায় আপাতত মুলতবী রাখি, তাহলে সাদামাঠা প্রশ্নটা এই দাঁড়ায়ঃ আমাদের নাট্যকার ও প্রযোজক কি বিভিন্ন নাট্য-সাহিত্যের ও নাট্য-প্রযোজনার উন্নত আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন? করছেন যে, নাটক রচনার ক্ষেত্রে তার প্রমাণ দিয়েছেন নুরুল মোমেন, সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, ফররুখ আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, সাইদ আহমেদ প্রমুখ নাট্যকারেরা। আর নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে তার প্রমাণ দিয়েছেন 'ড্রামা সার্কেল' 'সাতরং নাট্যগোষ্ঠী' ও অন্যান্যরা। নুরুল মোমেনের 'নেমেসিস' একটিমাত্র চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ নাটক। সমস্ত ঘটনাকে নেপথ্যে রেখে চরিত্রটির উপর তার প্রভাব প্রকাশের মাধ্যমে উপযুক্ত নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে নাট্য-রচনার এ কৌশল অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবীদার। সৈয়দ আলী আহসানের 'কোরবাণী' 'জোহরা ও মুশতারী' এবং 'জুলায়খা' বই হিসাবে ছাপা হয়ে বেরোয় নি। কিন্তু আঙ্গিকের পরীক্ষায় তাঁর রচনা প্রোজ্জ্বল। জাপানের 'নো প্লে'র আঙ্গিকের অনুসরণ তাঁর রচনায় লক্ষণীয়। জাপানের 'নো প্লে' মূলত একটি বিশেষ মঞ্চ-ব্যবস্থায় সঙ্গীতের আবহের মধ্যে প্রকাশিত একটি কাব্য। এই নাটকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একটি মৃত আত্মা তার মুক্তির জন্য পৃথিবীতে আসে এবং পৃথিবীতে তার সেই জীবন যাপনের কাহিনী ব্যক্ত করে। অবিশ্যি নাটকটি শেষ হয় তার বাঞ্ছিত মুক্তিতে। 'আনন্দ-আহত' চিত্তে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। আলী আহসানের রচনাগুলো মঞ্চে অভিনীত হলে এ আঙ্গিকের সার্থক্য বোঝা যেত। মুনীর চৌধুরীর 'কবর'ও আঙ্গিকের পরীক্ষায় বিশিষ্ট। যেমন বিশিষ্ট সিকান্দার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান' ও সাইদ আহমেদের 'কালবেলা' ও 'মাইল পোষ্ট'। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ফররুখ আহমদের কাব্যনাটক 'নৌফেল ও হাতেম' এক অভিযাত্রীক প্রচেষ্টা। কাব্য ও ছন্দ নাটকে অচল না হয়ে বরং তাকে সচল ও সজীব করে তুলতে পারে এ পরীক্ষার প্রমাণ 'নৌফেল ও হাতেম'। উল্লিখিত নাটকগুলো ছাড়াও ভালো নাটক আমাদের রয়েছে। এসব নাটকের আঙ্গিক ও নতুন প্রচেষ্টা অনায়াসেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর এ কথাও প্রমাণ করে যে বিশ্ব-নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের নাট্যকারদের পরিচয় পরোক্ষ হলেও অন্তরঙ্গ। উন্নতির পথে অনুসরণ অপরিহার্য। অনুসরণ তখন অন্বেষণেরই নামান্তর। শিল্প-সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য রত্ন অন্বেষণ সম্পূর্ণ কাম্য। বিভিন্ন সাহিত্যের রত্ন খুঁজে এনে তাকে সাধারণে প্রকাশ করার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে অনুবাদ ও এডাপ্টেশন। যুগান্তকারী বিদেশী নাটকের অনুবাদ ও এডাপ্টেশন করে আমাদের নাট্যকারেরা প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাচ্ছেন। নাট্য-সাহিত্যের জনক গ্রীক-নাট্যকারেরা।

www.pathagar.com

'সফোক্লিস'-এর 'ইডিপাস রেক্স' গ্রীক-নাটকের মধ্যমণি। তার অনুবাদ করে সৈয়দ আলী আহসান আমাদের নাট্য-সাহিত্যকে দীপ্তিময় করে তুলেছেন। গল্‌স্‌ওয়ার্দি ও বার্নার্ড শ'কে এদেশে পরিচিতির ব্যাপ্তি দিতে চেষ্টা করেছেন মুনীর চৌধুরী। কবীর চৌধুরী করেছেন ইবসেন ও ক্লিফর্ড ওডেট্‌সের অনুবাদ। আর্থার মিলার ও বার্নার্ড শ'র নাটকের অনুবাদ করেছেন বজলুল করিম। অনুবাদের ক্ষেত্রে আবদুল হকের দানও যথেষ্ট। এমনি করে নিজস্ব রচনা ও অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের নাট্যকারেরা যে উদ্যম ও প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন, তার সামগ্রিক প্রকৃতি এই কথাই প্রমাণ করে যে, সাধনা দিয়ে সাধ্য বাড়ানো যায়। আর তাতে সাধও অপূরণ থাকার কথা নয়। নাট্যান্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত এখনও কিছুটা অন্ধকারে, সন্দেহ নেই। তবু নাট্যকারেরা দীপ জ্বালাচ্ছেন একটি দুটি করে। অবিশ্যি দীপান্বিতার জন্য এখনও অনেক দীপের প্রয়োজন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, 'কবর' ছাড়া উপরোক্ত নাটকগুলোর অধিকাংশই গুণগতভাবে না হলেও প্রকৃতিগতভাবে 'দ্বীপান্তর' মডেলের অনুসারী। ইতিমধ্যে ঢাকা নগরীর নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক নতুন দিগন্ত। সর্বজনাব মাকসুদুস সালেহীন, বজলুর রহমান প্রমুখ তরুণ নাট্যকর্মীদের দ্বারা গঠিত হয় 'ড্রামা সার্কেল'। কার্জন হলে তাঁদের দ্বারা মঞ্চস্থ 'রক্ত করবী' আমাদের এখানকার প্রয়োগ-পদ্ধতিতে আনে এক বিরাট পরিবর্তন। অতঃপর মাকসুদুস সালেহীন নাটকে প্রশিক্ষণ লাভের উদ্দেশ্যে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে। কিছুদিন পর এমনি নতুন আধুনিক প্রয়োগ পদ্ধতিতে বজলুর রহমানের নেতৃত্বে মঞ্চস্থ হয় সাইদ আহমেদ রচিত 'কালবেলা'। 'কালবেলা'র মঞ্চায়ন এজন্য বিশেষ উল্লেখের দাবীদার যে নাট্যকার সাইদ আহমেদ তাঁর নাটক রচনা করেন সম্পূর্ণ আধুনিক টেকনিকে। 'নেমেসিস' এর পর 'কবর' ও 'কালবেলা'ই আমাদের আধুনিক নাটকের পথিকৃৎ। আধুনিক পদ্ধতিতে রচিত সাইদ আহমেদের অন্য নাটক 'মাইল পোস্ট' মঞ্চস্থ করে আমারই নেতৃত্বে সংগঠিত 'সাতরং নাট্যগোষ্ঠী'। এখানে স্মরণীয় যে, ১৯৬১-৬২ সালে বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ড্রামা-সিজন কমিটি'। বাংলা একাডেমীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ছোট-খাটো একটি নাট্য-মঞ্চ। প্রয়োজনের তুলনায় নেহায়েতই সামান্য আয়োজন। তবুও পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার জন্য নাই-মামার মধ্যে নিশ্চিত ভাবেই সেটা ছিল কানা-মামা। পরপর কয়েক বছর ধরে ড্রামা-সিজন কমিটির মাধ্যমে সরকারী অর্থানুকূল্যে পালিত হয় নাট্য-মওসুম। নতুন পুরনো বিভিন্ন নাট্য সংস্থা পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার সুযোগ পায়। বৃদ্ধি পায় আমাদের নাট্য-অভিজ্ঞতার সঞ্চয়।

www.pathagar.com

তদুপরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মঞ্চ ব্যবস্থাসহ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের অডিটোরিয়াম নির্মিত হওয়ার পর ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক নতুন উদ্যম। কবি শাহাদত হোসেনের 'মসনদের মোহ' থেকে আরম্ভ করে আমাদের বিভিন্ন নাট্যকারের নাটক এবং সৈয়দ ওয়ালিউল্লা'র 'তরঙ্গভঙ্গ'র অভিনয়ের মাধ্যমে পালিত হয় নাট্যোৎসব। তা ছাড়াও মঞ্চস্থ হয় 'ক্রীতদাসের হাসি' ও অন্যান্য নাটক।

ইতিমধ্যে মাকসুদুস সালেহীন ও বজলুর রহমানের অনুপস্থিতিতে 'ড্রামা সার্কেল' অনেকটা ঝিমিয়ে পড়ে। 'সাতরং'-এর সঙ্গে কাজ করতে আসেন সর্বজনাব নজমুল হুদা, সৈয়দ আহসান আলী, আবদুল্লাহ্ আল-মামুন, আতাউর রহমান, জিয়া হায়দার, ফখরুজ্জামান চৌধুরী প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরুণ নাট্যকর্মীরা। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, আধুনিক নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে আমি এসব নাট্যকর্মীদের যথেষ্ট কাজের সুযোগ দিতে পারি নি। বিশেষভাবে জনাব আতাউর রহমান তখন বিদেশী আধুনিক নাটকের চর্চায় অধীর আগ্রহী। ইতিমধ্যে জিয়া হায়দার বিদেশ থেকে নাটকের উপর ডিগ্রী করে আসেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আতাউর রহমান ১৯৬৮ সালে গড়ে তোলেন 'নাগরিক নাট্যসম্প্রদায়'। জাঁ পল সার্ত্রের 'ইন ক্যামেরা' নাটকের অনুবাদ (দ্বাররুদ্ধ) মঞ্চস্থ করার জন্য প্রাণপাত করেও ব্যর্থ হয়ে এই 'নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়' রেডিও-টেলিভিশনে নাটক করতে আরম্ভ করেন। অল্পদিন পরেই ভাঙা-গড়ার প্রক্রিয়ায় নাগরিক-এ এসে যোগ দেন আলী যাকের। আতাউর রহমান-আলী যাকেরের নেতৃত্বে নব উদ্যমে তাঁরা লেগে থাকেন আধুনিক নাট্য-স্বপ্নের বাস্তবায়নে।

পুনশ্চ ঃ স্মৃতি থেকে লিখেছি বলে দেখা গেল, ১০৮ পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ কিছু নাম বাদ পড়ে গেছে। যেমন ঃ এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম (বর্তমানে ডক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক), কাজী ফজলুর রহমান (বাংলাদেশ সরকারের ভূতপূর্ব শিক্ষা সচিব), সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ (মরহুম 'চিত্রালী' সম্পাদক), —এঁদের প্রথমজন ১৯৪৯ সালে আমার রচিত 'বিরোধ' নাটকে এবং পরের দুইজন ১৯৫০ সালে আমারই রচিত 'পদক্ষেপ' নাটকে 'বিশেষ' চরিত্রে অভিনয় করেন। এমনি আরও আরও নাম আমার উল্লেখ থেকে বাদ পড়েছে হয়তো। বইটি পরবর্তী সংস্করণের মুখ দেখলে এসব ত্রুটি সংশোধনের আশা রইল।

www.pathagar.com

বারো/পরিশিষ্ট ঃ যাত্রা ও নাটক

(১৯৬৫ সালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পত্রিকা 'সংযোগে' প্রকাশিত)

দো-টানায় মানুষ হরহামেশাই পড়ে। কিন্তু তে-টানায়ও যে মানুষকে পড়তে হয়, তার উপলব্ধি ঘটল এ প্রবন্ধের অবতারণা করতে গিয়ে। তৃতীয় টানটি আসছে নাটকের প্রকৃতি-নির্ণয় প্রসঙ্গে। উনিশ শতক থেকে প্রতীচীর যে নাটক আমাদের একদা-রাজধানীতে আনাগোনা শুরু করেছিল, কালক্রমে তা-ই আজ শহরে-বন্দরে গঞ্জে-গ্রামে বিচরণশীল। মাঝে মধ্যে তার দেখা হয় ঐতিহ্য-ভারবাহী যাত্রার সঙ্গে। অনেকটা নগরে-বন্দরে চলমান অর্ধ-আধুনিক পথ-যানের সঙ্গে ভগ্নস্বাস্থ্য ঘোড়ার গাড়ীর মোলাকাত হওয়ার মত। তবে এ সাক্ষাৎকার নগরের চেয়ে গঞ্জেই সংঘটিত হয় বেশি। দুয়েরই অবস্থা সহানভূতির দাবীদার। লেবাসে আর স্বভাবে পূর্ব-কৌলীন্য হারিয়েছে দুই-ই। দুয়েরই জন্ম ও জীবন-ধারা আজ জটিলতায় আচ্ছন্ন। এ প্রবন্ধে সে জটিলতার জট সাধ্যমত খুলে তাদের পরিচয় ও সম্পর্ক-নির্ণয় করার চেষ্টাই আমাদের উদ্দেশ্য। হীনাবস্থায় পড়লেও যাত্রা প্রথমেই খাঁটি স্বাদেশিকতার গর্ব করবে, করে ইঙ্গিত করবে নাটকের সংকরত্বের প্রতি। আর তা করলেও যে খুব অন্যায্য হবে, তা নয়। আমাদের নাটকের কথাটাও এসে পড়বে। আর তখনই মালুম হবে যে যাত্রা ও নাটকের পরিচয় শুধু দু'শ' বছরের নয়, দু'হাজার বছরেরও বেশি। এবং যেহেতু দুহাজারেরও অধিক বছরের ওপার থেকে কথাটা আরম্ভ করতে হচ্ছে, সেহেতুই সংস্কৃত নাটকের পাশাপাশি গ্রীক নাটকও দাঁড়াবে এসে। তাই যাত্রা, সংস্কৃত নাটক এবং গ্রীক তথা পাশ্চাত্ত্য নাটক—এই তিনের টানেই হয়েছে তে-টানার সৃষ্টি।

গ্রীক নাটক ও সংস্কৃত নাটক প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন যে, সংস্কৃত নাটক গ্রীক নাটকের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। অর্ধ-শতাব্দীরও আগে ভারতের সরগুজা স্টেটের রামগড়ের গুহা ও সেখানকার দুটি শিলালিপির বিবরণ পর্যালোচনা করে ডক্টর ব্লক মত প্রকাশ করেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

"It will likewise be admitted that the adoption of the stage of a Greek theatre in an Indian building, that served similar purposes, has a strong bearing upon the question of the Greek influence on the Indian drama". (Bloch, Archaeological Report, 1903-04, p. 127.) ডক্টর ব্লকের মতে, সীতা বেঙ্গাগুহা গ্রীক ভাস্কর্য-বাহুল্যের যুগে গ্রীক আদর্শে নির্মিত খৃষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের এক ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ। এই গুহায় নাকি বসন্ত উৎসবে নারী-পুরুষ মিলে বেশ জমিয়ে নাটকের অভিনয় চলত। প্রফেস্যর রীচও শুধুমাত্র সাহিত্যের মাপকাঠি দিয়েই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, সংস্কৃত নাটক গ্রীক নাটকের কাছে অনেকাংশে ঋণী। কিন্তু অন্য প্রমাণেরও অভাব নেই। বরং সেসব প্রমাণই ওজনে ভারী। ডক্টর কীথ বলেছেন যে কলা শিল্প প্রভৃতি যে সব বিভাগে গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট সেসব বিভাগে আজও সেই সেই প্রভাব বিদ্যমান। কিন্তু সংস্কৃত নাটকে গ্রীক নাটকের তেমন প্রভাব বিদ্যমান, তা নির্ধারিত হয়নি। বরং মিলের চেয়ে অ-মিলের কথাটাই কীথ সাহেব তুলে ধরেছেন। "But there is one salient distinction between Indian and Greek drama which adds to the improbability of the derivation of the former from the latter. The Indian drama must end happily, just as Krisna kills Kansa, the red the black, rather than black the red——" (Keith, J. K. A. S., 1909)। ডক্টর ষ্টেনকোনো বলেন ঃ "The oldest Indian plays we know , the Aswaghosha Fragments published by Professor Liders, do not remind us of the Greek stage at all." অথচ সংস্কৃত নাট্যকার অশ্বঘোষ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলে ষ্টেনকোনো ও স্যার মার্শাল মত প্রকাশ করেছেন। আর প্রফেস্যর গিলবার্ট মারের মতে গ্রীক সাহিত্যে নাটক পদবাচ্য প্রথম গ্রন্থ Theapis খৃষ্ট-পূর্ব ৫৩৪ অব্দে রচিত হয়। (History of Greek Literature, Hineman)। শ্লিগেল আবার বলেছেন ঃ "Among , the Indians, whose social institution and mental cultivation descent unquestionably from a remote antiquity, plays were known long before they could have experienced any foreign influence. It has lately been made known to Europe that they possess a rich dramatic literature..."(Schlegel's Dramatic Literaturc.)। এই সব মতামতের উপর ভিত্তি করে বলতে সাহস

www.pathagar.com

পাওয়া যায় যে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য প্রাচীন কাল থেকেই স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয়ে নিজের উন্নতি ও পরিপুষ্টির পথে এগিয়েছিল, যেমন স্বাতন্ত্র নিয়ে এগিয়েছিল গ্রীক নাট্য সাহিত্য। তাছাড়া সাদৃশ্য যদি কিছু থাকেও, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। কারণ যে প্রেরণা থেকে নাটকের জন্ম, সে প্রেরণা মানুষের আদি বৃত্তিজাত। এবং আদি বৃত্তিজাত বলেই দুই বিভিন্ন জনপদে পরস্পর অনপেক্ষ হয়েই দুটি নাট্যধারার উৎপত্তি সম্ভব। "মানুষের মানসিক বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে নাট্য-বৃত্তি ও অনুকরণ-বৃত্তি নামে দুইটি বৃত্তি আছে। বৃত্তিগুলির ধর্ম এই যে, ইহারা অজ্ঞাতসারে মানুষের উপর আধিপত্য স্থাপন করে,.....নৃত্য গীত ও বাদ্যের সমবায়কে নাট্য কহে। নৃত্য দেখিবার, গীত ও বাদ্য শুনিবার যে স্বাভাবিক স্পৃহা, তাহাই নাট্য-বৃত্তি এবং ঐ নাট্যবৃত্তির প্রেরণায় নৃত্য, গীত ও বাদ্য—যাহা দেখা বা শুনা হইল, মানসপটে তাহাদের চিত্রাঙ্কন করিয়া পুনরভিনয়ের চেষ্টাই অনুকরণ বৃত্তি।" (শ্রী সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, দৃশ্যকাব্য পরিচয়, পৃঃ ১)। আর এরিষ্টটলের বাণী তো রয়েছেই "Imitation is instinctive in man from his infancy and no pleasure is more universal than what is given by imitation"। আর এক ধাপ এগোলেই নাটকের সংজ্ঞার সন্ধান মিলবে। প্রফেসার শ্লিগেলের মতে "One step more was requisite for the invention of the Drama, namely, to separate and extract the imitative elements from the separate parts of social life and to present them to itself again collectively in one mass." কাজেই আদিবৃত্তি যেখানে এক, সেখানে একের প্রভাবে অন্য প্রভাবিত না হয়েও নিজেদের সমাজ জীবনের অনুকরণীয় অংগগুলো পৃথক করে নিয়ে সেগুলোকে চুম্বকভাবে একটি ঘটনার অঙ্গীভূত করে তার এককালীন পুনঃপ্রদর্শনের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন নাট্যসৃষ্টি সম্ভব। তাই স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট দুটি জাতি যে নিজেদের প্রকৃতিগত অনুকরণ বৃত্তির বলে ও দেশ-কালাদি পারস্পরিক অবস্থার প্রভেদে স্বতন্ত্র দুটি নাট্যশিল্পের জন্ম দেবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। ব্যাপারটা আদির বলেই আরও স্বাভাবিক। যেমন প্রেম মানুষের আদি বৃত্তিনিচয়ের একটি বৃত্তি। এবং গুরু ছাড়াই এই বৃত্তিটার প্রাদুর্ভাব অনেকের হৃদয়ে ঘটে থাকে। কোন প্রভাবের প্রয়োজন হয় না। কোন্ দেশে, কোন্ সালে প্রেমের উৎপত্তি, তারপর কোন্ কোন্ দেশের হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার জয়যাত্রা—এসব নিয়ে কেউ গবেষণা করতে চাইলে তার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই সংস্কৃত নাট্যকর্মের সঙ্গে যদি গ্রীক নাট্যকর্মের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়াই যায়, তাহলে তার কারণকে আদি বৃত্তির ধর্মস্থ জ্ঞান

www.pathagar.com

করাই বিধেয়। টিকাটিকিতে গিয়ে সমস্যা টিকিয়ে রাখা কোন কাজের কথা নয়।

নাট্যাভিনয়ের উৎস-সন্ধানে উৎসুক হলে, বলা বাহুল্য, কালের অনেকটা উজান বেয়ে আমাদের হাজির হতে হবে এমন যুগে যখন প্রাচ্যের এই ভূভাগে দেবতারা শাসনকার্য চালাতেন। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, বৈদিকযুগে অনুন্নত জনসাধারণ যখন বেদের নীরস তত্ত্বকথার রসহীনতায় বিরক্ত হয়ে নিজেরাই কিছু কিছু আনন্দ রসের ব্যবস্থা করতে থাকে, এবং যার জন্য সমাজে বেশ "পাপাচরণ" আরম্ভ হয়ে যায়, তখন সমাজ রক্ষক ঋষিগণ স্বভাবতই চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু স্থির প্রজ্ঞাসম্পন্ন ঋষিগণ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ সুফলদায়ক হবেনা ভেবে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য সহজবোধ্য কোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রকে অনুরোধ জানান। দেবরাজ উপযুক্ত ব্যবস্থার কোন হদিস না পেয়ে অগত্যা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তখন সবেমাত্র স্বয়ম্ভুর কাছ থেকে নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে দেবাসুরের সংগ্রাম বিষয়ে নাট্যরচনায় ব্যস্ত। ব্যবস্থা হয়েই গেল। ভরত ও ভরতসুতগণকে নাট্যাভিনয়ের আদেশ দিলেন ব্রহ্মা। স্বর্গভূমিতে আরম্ভ হল অভিনয়। দেব, নর, অসুর—সবাই সে নাট্যাভিনয়ের দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলী। কিন্তু অল্প পরেই আরম্ভ হয়ে গেল মহা গোলমাল। অভিনয়ের বিষয়বস্তু, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থায় অপমানিত বোধ করার ফলেই বিরূপাক্ষ প্রমুখ অসুরবৃন্দ কর্তৃক গোলযোগের শুরু। ফলে অনন্যোপায় হয়ে নাটকের উদ্যোক্তারা ইন্দ্রধ্বজরূপ প্রহরণ দ্বারা (অর্থাৎ লাঠি জাতীয় কিছু দ্বারা) দৈত্যগণকে 'জর্জরীকৃত দেহে তাড়িত ও নিহত করিলেন।' উল্লেখযোগ্য যে, সেই থেকে নাকি ইন্দ্রধ্বজের নাম হয়েছে "জর্জর"। অভিনয় আর শেষ হতে পারল না। তবে অভিনয়ের চল্ হয়ে গেল। এই গোলমালের অভিজ্ঞতা থেকেই দেবতারা পরবর্তী অভিনয়ানুষ্ঠানের জন্য নাট্যমন্ডপের ব্যবস্থা করেন। আর করেন অভিনয় চলাকালে উপযুক্ত জর্জরের ব্যবস্থা। এই উপলক্ষেই সাধারণের চিত্তবিনোদনের জন্য চতুর্বেদ থেকে সংকলন করে নাট্যবেদ নামে পঞ্চম বেদের সৃষ্টি হয়। ঋকবেদ থেকে কথোপকথন, সামবেদ থেকে সংগীত, যজুঃ থেকে ভাবরাজি, এবং অথর্ববেদ থেকে সাজসজ্জার উপকরণ গ্রহণ করে প্রণীত হয় নাট্যবেদ। ব্রহ্মা যে শংকরের নিকট থেকে নাট্যশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করে ভরতকে এই জ্ঞান দান করেন, তাতো আগেই বলা হয়েছে। যাই হোক, প্রথম নাট্যাভিনয়ের প্রয়োগ-প্রধান ছিলেন ভরত। এবং জর্জর ব্যবহারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলেও ভরত ও ভরতসুতগণের প্রয়োগে দেবতারা খুশীই হলেন। মানব-সমাজে নাট্যাভিনয় প্রচারের দায়িত্ব বর্তালো ভরতের উপর।

www.pathagar.com

উপযুক্তভাবেই ভরত সে দায়িত্ব পালন করলেন। মানব-সমাজে চিত্ত-বিনোদন ও উপদেশ বিতরণকল্পে নাট্যাভিনয় হয়ে দাঁড়াল এক অপূর্ব ব্যবস্থা। লক্ষণীয় যে ধর্ম অর্থ যশ প্রভৃতির উপদেশ, ইতিহাস ও শাস্ত্রার্থের নির্দেশ এই নাট্যবেদে লোকশিক্ষার্থ নিবদ্ধ হল। হিন্দু নাট্যশাস্ত্রের মতে এই হল মানব-সমাজে নাটক প্রচারের ইতিহাস।

কিন্তু শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস যাদের যথেষ্ট দৃঢ় নয়, যারা সমাজ-বিবর্তনের গতিপথে নাটকের বিকাশ দেখতে উৎসাহী, তারা নাটকের ইতিহাসকে অন্য রূপে প্রকাশ করার প্রয়াসী। উইলিয়ামস্ ম্যাকডোনেল, ওয়েবার প্রমুখ পন্ডিতদের মতে নৃত্য বা নাচ থেকেই এ দেশীয় নাটকের উৎপত্তি। সংস্কৃত নৃত্ ধাতু থেকে প্রাকৃত নট্ ধাতুর উৎপত্তি। আর তা থেকেই নট নাটক এসব কথা এসেছে। প্রথমে আনন্দের যোগান দেওয়ার জন্য কিছুটা অশ্লীল জাতীয় অঙ্গবিক্ষেপ, তারপর তাল-লয়ের সঙ্গে লাস্য সংগীত এবং অবশেষে হাবভাবের প্রকাশক কথোপকথনের বিন্যাস—এই হচ্ছে বিকাশের পথে নাটকের ক্রম অভিব্যক্তির ধারা। অনেকেই স্বীকার করেন, অতি প্রাচীনকালে এ দেশের আদিম অধিবাসিগণ নিজেদের অপভ্রংশ ভাষায় এইসব নাটকের অভিনয় করত। এমনি নৃত্যগীতের প্রমাণ পাওয়া যায় অথর্ব বেদসংহিতায়। গ্রিয়ারসন, সিলভাঁ লেভি, বার্থ প্রমুখ পন্ডিতবর্গ এবং কতক পরিমাণে কীথের মতে আর্যদের নাট্যাভিনয়ের প্রবর্তন এইসব লোকনাট্যের অনুকরণেই ফল। পিশেল বলেন, নাটকের পূর্ব নিদর্শন হিসাবে পুতুলের সং খেলাকে ধরা যায়। "It is not improbable that the puppet is in reality everywhere the most ancient form of dramatic representation. Without doubt this is the case in India." (Mrs. Vyvyan's Translation of Pischel's the Home of the Puppet Play.)

খোলা জায়গায় সাধারণ লোকেরা নানা রকম সং নিয়ে চিত্তবিনোদনে মত্ত হত। কালক্রমে এসব সং-এর মুখে কথা এল, এবং হাজির হল এসে রঙ্গমঞ্চে। অবিশ্যি এক গাছি সূত্রের সাহায্যে। এবং সং-এর মুখের যে কথা, তা আসলে ছিল রঙ্গমঞ্চের নীচে বা পাশে লুকিয়ে থাকা মানুষেরই কথা। হাল যামানার পুতুলনাচের ইতিকথার প্রথম কথা রচিত হল এভাবেই। আরম্ভ হল মানুষের নাট্যাভিনয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে এমনি পুতুলের উল্লেখ রয়েছে হর্ষচরিত, বাসবদত্তা ও মহাভারতে। যাক, যে ব্যক্তিকে সূত্র ধারণ করে সং-এর পুতুলকে সময় মত নানাভাবে নাচাতে হত, তাকেই বলা হত সূত্রধার। আর সং উত্থাপিত

www.pathagar.com

করত যে ব্যক্তি, তাকে বলা হত 'উত্থাপক' বা 'স্থাপক'। পরবর্তীকালে একই ব্যক্তি যে দুটি কাজই সম্পন্ন করত, তার প্রমাণ আছে। পিশেলের বিশ্বাস, বৈদিক যুগের আর্যগণ এই প্রথার অনুকরণেই তাদের ক্রিয়াকান্ডের মধ্যে গান ও কথোপকথনের সন্নিবেশ করেন। আর কালক্রমে পরিমার্জনার মাধ্যমে এই প্রথাই শিষ্টজনের জন্য নাটক সৃষ্টির পথ সুগম করে। তাঁর মতে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রের সন্নিবেশ অনার্যদের নাট্য প্রয়োগের বিশেষ একটি দিকেরই অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক বহন করে আসছে। "Literature in India early came into the hands of the priests and it is quite incredible that they would have adopted a figure such as the Vidusaka into the artistically developed drama, had it not been so closely connected with the stage in the minds of the people that its exclusion was impossible."

এতক্ষণ নাটকের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে দুটি মত তুলে ধরা হল। একটিতে সর্বাঙ্গে শাস্ত্রাবৃত গ্রীক দেবী মিনার্ভার মত সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য মানুষের কাছে মূর্তি পরিগ্রহ করে। অন্যটিতে আদি লোক-নাট্যের অনুকরণে শিষ্ট-জনের জন্য সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি হয়। লোকনাট্য তো লোকের জন্য পাশাপাশি থাকেই। কোন্ মতটা অধিকতর সত্য তা নিয়ে মাথা না ঘামাতে চাইলে বিষয়টির ইতি হয়ে যাওয়ার কথা এখানেই। কিন্তু মাথা ঘামাতেই হয়। কারণ শাস্ত্রকারেরা বিষয়টির ইতি ওখানেই টেনে দেন নি। তার জেরও টেনেছেন খানিকটা শাস্ত্রানুসারে। জর্রোৎসবের পর অসুরগণ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে নি। তারা আর্য-নাট্য প্রয়োগের অনুকরণে নাকি নিজেদের ভাবে ও ভাষায় এক রকমের অভিনয়ের প্রবর্তন করে। নাট্যশাস্ত্রে আভাস আছে, জনকয়েক অসন্তুষ্ট নাট্য-প্রয়োগনিপুণ ব্রাহ্মণও অসুরদের দলে যোগ দেন। ফলে অনার্যদের মধ্যে নাট্যপ্রয়োগের উন্নতি সাধিত হয়। আর এই নাট্যশিল্পই কালে আখ্যায়িত হয় "দেশী নাট্য" নামে। ফলে আর্যদের "মার্গ নাট্য" যেমন চর্চিত ও পুষ্ট হতে থাকে, পাশাপাশি তেমনি চর্চিত ও পুষ্ট হতে থাকে অনার্যদের "দেশী নাট্য"। পিশেলের উল্লিখিত পুতুলের সং-তামাসা দেশী নাট্যেরই প্রাচীন নিদর্শন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত বিদ্যার তালিকায় যে জনবিদ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, (এবং নৃত্য-শিল্প-বিজ্ঞান যে জনবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত), তা থেকে ও মহাভারত থেকে দেশী নাট্য-সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ও লোকপ্রিয়তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু মাথা ঘামাতে হয় অন্য একটি ব্যাপার নিয়ে। স্বর্গভূমিই বা কোথায় এবং সে স্বর্গভূমি থেকে মাটির পৃথিবীতে নাটকের আবির্ভাব হলই বা কি করে ?

www.pathagar.com

স্বর্গ কোথাও নিশ্চয়ই আছে যা মর্তের সাধারণ মানুষ আমরা জানি না —এ কথায় খুঁটি গাড়লে আর কথা চলে না। কিন্তু আরও কথা চলে যদি আমরা ধরে নিই যে, স্বর্গটা রূপক এবং তাই স্বর্গ থেকে নাটকের মর্তে অবতারণাও রূপক। কি করে যে কথাটা আরও চলে তা বলতে গেলে কিছুটা শিবের গীতের প্রয়োজন। এবং গীতটা শিব সম্পর্কেই। ভারতের নাট্য-শাস্ত্রানুযায়ী শিব, ব্রহ্মা, ভরত ও ভরতসূতগণ—এই হচ্ছে নাট্যাচার্যগণের ক্রমধারা। শিব শুধু নাট্যশাস্ত্রজ্ঞই নন, শব্দশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের আদিম প্রযোক্তা বলেও তিনি নির্দিষ্ট হয়ে থাকেন। তিনিই নটরাজরাজ, নটেশ্বর, মহানট, আদিনট ও নাট্যপ্রিয়। কাজেই নাটকের সঙ্গে শিব যে খুবই জড়িত, তা অনুমেয়। এখন শিব যে কাদের দেবতা—আর্যদের না অনার্যদের—এ নিয়েই সৃষ্টি হচ্ছে জটিলতা। সাক্ষ্য প্রমাণে এর ফয়সালা করা সহজসাধ্য নয়। তবে সাক্ষ্য প্রমাণ ঘেঁটে যোগ্য প্রমাণাভাবে অগত্যা benefit of doubt-এর মাধ্যমে এগোলেও মামলা একটা রায়ের পথে মোড় নিতে পারে। আর্যদের কাছে শিব তো দেবাদিদেব মহাদেব। উনি না থাকলে তো চলেই না। কিন্তু অন্য পক্ষও দাবী ছাড়বে কেন যে শিব আদিম অধিবাসীদের দেবতা! কাজেই আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে যে নাটকের প্রথম বিকাশ হয়, তা তো নাট্যাচার্য-গণের ক্রমধারায় যেখানে শিবের নামটি প্রথমে আছে, তা থেকেই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে, স্বর্গ ও বৈদিকযুগের দেবতাদের সঙ্গে নাটকের জন্ম-কথা জড়িত, এমন প্রমাণ রয়েছে। লেভি প্রমুখ পন্ডিতগণও সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে বেদের অল্পবিস্তর সম্পর্কের কথা স্বীকার করেন। অনেকেরই ধারণা যে, ঋগ্বেদ সংহিতার সংবাদসূক্তসমূহেই রয়েছে ভাবী নাটকের বীজ। বৈদিক যুগের দেবতাদের পারস্পরিক এবং দেবতা ও ভক্ত ঋষির মধ্যে কথোপকথন নিবদ্ধ রয়েছে ওই সব সূক্তে। শাস্ত্রের ধারা বেয়ে অগ্রসর হলে দেখা যাবে, বৈদিক যুগের রুদ্রের প্রতিনিধিই পরবর্তী যুগের শিব। পদবী পরিবর্তন শুধু এক দেবতারই হয় নি। বৈদিক যুগের উত্তর কালের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি পরবর্তী যুগে ব্রহ্মা। পরবর্তী যুগের ইন্দ্র আগে দেবতা নামে অভিহিত থাকলেও অর্চিত হতেন তিনি শুধু "কামবর্ষী পর্জন্য" ভাবেই। কাজেই পরবর্তীকালে যা প্রাকৃতিক শক্তির স্তুতি ও আনুকূল্যার্থে ঋক্ সংহিতায় স্থান পেয়েছিল, তা-ই পরবর্তীতে রূপকের ছলে নাটকের জন্ম বৃত্তান্তে অতি-লৌকিকত্বের অবতারণা করেছে। অনেক বিশেষজ্ঞেরই ধারণা যে, জাপানী গীতিনাট্য ও গ্রীক নাট্যও জন্ম নিয়েছে এমনি প্রাকৃতিক শক্তির স্তুতি থেকে। অন্ধকারাবৃত গলিপথে স্বল্প জ্ঞানের নিবু নিবু প্রদীপ হাতে আর অগ্রসর হতে চাই না। টিকাটিপ্পনির পথ এড়িয়ে সিধে রাস্তায় আন্দাজ করে করে

www.pathagar.com

এগোলে বলা যায়, সিদ্ধান্তের জন্য টানাটানিতে পড়লেও প্রধানত শিব এ দেশের আদিম অধিবাসীদেরই গুরুস্থানীয় কেউ হবেন।

প্রথমত, বিভিন্ন দেবতার পূজা-ব্যবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, শিবের পূজা ব্যবস্থাটাই সবচেয়ে সহজ, আড়ম্বরহীন। খুবই অল্পে তিনি তুষ্ট হন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়বে, আর্যগণ ও'র জন্য বেশি মাথা ঘামানোর জরুরৎ মনে করেন নি। ও'র মনের সারলোর পরিমাণ জেনে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, ওই মনে তুষ্টির জোয়ার আনতে বিল্ব-পত্রই যথেষ্ট। বড় সরল, "অনার্য" নামধারীদের মতই যেন।

দ্বিতীয়ত, মর্তবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন দেবতার ভক্ত-সংখ্যার পরিস্থিতি অনুধাবন করলেও দেখা যাবে, শিব-ভক্তরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এর প্রধান কারণ হল, মর্তভূমির যে অংশটাতে দেব-ভক্তদের বসবাস, সে অংশে সাধারণ বা পতিত বা অনার্যদের সংখ্যাই অনেক বেশি, এবং শিবের ভক্ত প্রধানত এ'রাই। তাতে মনে হয়, নিজেদেরই এক দরদী নেতাকে যেন তাঁরা সমর্থন করেছেন।

তৃতীয়ত, দেবতাদের চরিত্র-প্রকৃতির কথাটাও ভাবা যায়। সরল শিব পরম দয়াময়ও বটে। দুষ্কৃতিকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদান তিনি যত না করেছেন, তার চেয়ে বেশি করেছেন প্রসাদ-দান। খুশী হয়ে এক অনার্যকে তো একবার বর দিয়ে বসলেন, যার মস্তকে সে হাত রাখবে তার মস্তকই উধাও হবে। বরপ্রাপ্ত অনার্যটি তো শিবের মাথাতেই প্রথম পরীক্ষা চালাতে চাইল! বিপদটা যে কি তা উপলব্ধি করেই শিব দৌড়তে লাগলেন, পেছনে পেছনে বরপ্রাপ্ত অনার্য। অবশেষে অন্যজনের উপদেশে শিব ভক্তকে বললেন, তার নিজের মাথার উপরই পরীক্ষাটা চালিয়ে দেখতে। স্বভাবতই সরল ভক্ত নিজের মাথা উধাও করে দিয়ে অক্কা পেল, শিবও বেঁচে গেলেন। লক্ষণীয় যে, উপদেশটি দিয়েছিলেন যিনি, তিনি বুদ্ধিমান এক দেবতা—শ্রীকৃষ্ণ। মনে হয় না যে শিব একটু কম বুদ্ধিসম্পন্ন অনার্যদেরই কাছ-ঘেঁষা ?

চতুর্থত, শিব-কল্পনার ক্রমধারা অনুসরণেও শিবকে জনতার সঙ্গে জড়িত বলে মনে হবে। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষের সমবেত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রাচীন সাহিত্য সাক্ষ্য বহন করে যে গাজনাদি উৎসবও খুব প্রাচীন। ক্ষেত্র থেকে শস্য সংগৃহীত হবার সময়ে উৎসবের আয়োজন করা হত। তাতে থাকত ভোজনাদি ব্যাপার ও নৃত্যগীত। সূর্য অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা করে, ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য সোমরস ও পশু মাংস নিবেদন করে এবং তৎপরে গ্রামবাসী একত্রে আহার সমাপ্ত করে বাড়ি ফিরত লোকেরা। (আদ্যের গম্ভীরা, শ্রী হরিদাস পালিত পৃঃ ১০২)। "বৈদিক কালের লোকসমাদৃত ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঋভুগণের উদ্দেশ্যে স্তব ও পূজা করিত। তাঁহাদিগকে সোমরস প্রদানের

www.pathagar.com

পর আপনারা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। নর-নারী একত্রে নৃত্য করিত, সামাদি বৈদিক গীতদ্বারা দেবতার প্রীতি সম্পাদন করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িত।

ক্রমশঃই জটিলতা বৃদ্ধি পাইল। কল্পনা প্রভাবে নব নব উৎসবানুষ্ঠানের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

অগ্নি নানারূপে কল্পিত হইলেন এবং সুবৃহৎ জটিলতাপূর্ণ যজ্ঞীয় উৎসবের সূচনা হইল। অগ্নি তখন একা নহেন।.....পুত্র-কন্যা লইয়া অগ্নিবংশ বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বিষ্ণু, পাঞ্চজন্য, অগ্নি, দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞে স্থান পাইলেন। শিবাগ্নিও যজ্ঞে স্থান পাইলেন, তিনি শক্তি পূজাপরায়ণ। .....সুতরাং সেই প্রাচীন কালে প্রকৃত মূর্তিপূজার অনুষ্ঠান না থাকিলেও সম্ভবীক শিবাগ্নি প্রভৃতি অগ্নিই পরবর্তীকালে মূর্তি পূজার মূল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।" (প্রাগুক্ত)। মহাভারতে দেখা যায়, অর্জুনকে পাশুপতাস্ত্র লাভের জন্য কিরাতবেশী শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। রামায়ণে শিব লংকেশ্বরের দ্বাররক্ষক। আর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শিবিররক্ষক। "ইহাতে মনে হয়, শিবের মূর্তি তৎকালে নির্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই সময়ে যজ্ঞবেদিকায় শিব মূর্তির প্রতিষ্ঠা না হইলেও পরবর্তীকালে শিব-মূর্তিবিশিষ্ট যজ্ঞ সম্পাদিত হইত।.....শিব এক্ষণে বৈদিক কালের শিবাগ্নি নহেন। তিনি একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা।" (প্রাগুক্ত)। এসব থেকেই মনে হয় আর্যরা যেন অনার্যদের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার একটা ব্যবস্থায় এসেছেন। আর শিবকে দেব-মন্ডলীতে দেবরূপে পেয়ে অনার্যরাও খুশী। আপনজনের সম্মানেই তো মানুষ সবচেয়ে খুশী হয়।

উপরোক্ত বক্তব্য যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে "মার্গ নাট্য" আর "দেশী-নাট্য" উভয়ের মূলেই থাকেন অনার্যগুরু শিব। স্বর্গ আর মর্তকে যথাক্রমে এ-দেশ বিজয়ী আর্যদের রাজধানী ও তার বাইরের বিজিত-অধ্যুষিত বিস্তৃত দেশটিকে ধরে নিলে ব্যাখ্যার পথ সুগম হয়। এবং তাহলে শেষতক ধারণা করা চলে যে, মাটির মানুষের "লোক নাট্য" বা "দেশী নাট্য"ই হচ্ছে আদি। উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী আর্যরা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত মানুষের আনন্দোৎসবের এই ফর্মটিকে গ্রহণ করে তাকে পরিমার্জিত ও পরিশোভিত করে নিজেদের ধারণানুযায়ী চিত্ত-বিনোদন ও লোক-শিক্ষার্থে ব্যবহার করেছিলেন। ক্রমে আর্যদের জ্ঞান-সংস্কৃতির আলোতে পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ফর্ম নতুন রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। ভারত-ভূমি পেল উন্নত মানের সংকৃত নাট্য-সাহিত্য। আর মানোন্নয়নের

www.pathagar.com

ক্ষমতা যাদের সীমিত, তারা লোক-নাট্যকেই নানা রং-এ নানা ঢং-এ লোক-চিত্তগ্রাহী করে করে এগিয়ে চললেন সময়ের পথ বেয়ে বেয়ে।

যাত্রাগান পরিবর্তশীল লোক-নাট্যের নানারূপেরই একটি রূপ। কিন্তু এ সম্পর্কে মতান্তরের অভাব নেই। কারও কারও মতে খৃষ্ট-জন্মের আগে থেকেই ভারতে নাকি কৃষ্ণ-বিষয় নিয়ে যাত্রা রচিত হত। তারই ধারা জয়দেবের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলায় এসে পড়ে। বাংলা দেশের পাঁচালী-গান থেকেই যাত্রার উৎপত্তি, এ কথাও কেউ বলেন। তাঁদের মতে এর আগে যাত্রার অস্তিত্ব ছিল না। দুটি মত যে খুবই ভিন্ন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটু কম ভিন্ন বিভিন্ন মতামতও রয়েছে। এই সব বিভিন্নতার কারণ, বিচার বিশ্লেষণোপযোগী প্রচুর তথ্যের অভাব। অপ্রচুর তথ্য-ভিত্তিক আলোচনার ফাঁক অগত্যা ধারণা দিয়েই ভরে নিতে হয়।

'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস'-এ শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য যাত্রা সম্পর্কে যে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচন্য করেছেন, যাত্রার উপর কোন কথা বলতে গেলে তাঁর মতের পথ মাড়াতেই হবে। অভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেনঃ শব্দটি যদি মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ হয়ে থাকে, তাহলে গমন অর্থেই তা প্রথম ব্যবহৃত হত। এই গমনের সঙ্গে উৎসব-অনুষ্ঠান জড়িত ছিল বলে কালক্রমে উৎসব অর্থেই শব্দটি সংস্কৃতে ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রাচীনকালে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষান্তর গমন উপলক্ষে উৎসবের অনুষ্ঠান হত। গ্রহাদির মধ্যে সূর্য মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে তার উপাসনাই ছিল ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই সূর্যের উত্তরায়ন, দক্ষিণায়ন প্রভৃতি কক্ষান্তর যাত্রা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব হত জাঁকজমকের সঙ্গে। পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ সূর্যোৎসব ছিল দাক্ষণায়নোৎসব। কারণ ঐ কৃষিজীবী ভূখণ্ডে তখন গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষার সূচনা। কৃষিজাত দ্রব্য তখন ঘরে তোলার সময়। রথযাত্রার উৎসবও হত তখনই অমনি কারণেই। বাংলা দেশের চড়কোৎসবের মূলেও রয়েছে বিষুবরেখায় সূর্যের অবস্থিতি। সূর্যের নব নব যাত্রা উপলক্ষে এইসব উৎসবের অনুষ্ঠান হত বলে কালক্রমে 'দেবতা' বিষয়ক যে কোন উৎসবকেই যাত্রা বলা হত বলে শ্রী ভট্টাচার্য মত প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালে বাংলা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তৃতির সময়ে কৃষ্ণবিষয়ক উৎসবাদি প্রাধান্য লাভ করায় সেসব কৃষ্ণযাত্রা নামে পরিচিত হল। ঝুলন যাত্রা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি কৃষ্ণ-যাত্রারই অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, এ-সবের সঙ্গে নৃত্য, গীত ও বাদ্য অঙ্গাঙ্গি জড়িত। আর রাসযাত্রা তো বারটি রাশির পথে সূর্যের পরিক্রমণকেই বোঝায়। ভক্তির প্রাবল্যে বৈষ্ণবেরা যদি সূর্য ও দ্বাদশ রাশিতে কৃষ্ণ ও গোপিকার রূপ দর্শন করে থাকেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

www.pathagar.com

এই হল যাত্রা শব্দটি সম্পর্কে একটি জোরালো মত। অন্য একটি জোরালো মতও ডক্টর ভট্টাচার্য উপস্থিত করেছেন। ছোটনাগপুরের ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে যাত্রা নামে একটি প্রধান অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। "ওরাও°-দিগের মধ্যে প্রতিবেশী গ্রামসমূহের অধিবাসী অবিবাহিত যুবক-যুবতী-দিগের সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের নাম যাত্রা। .....বৎসরের মধ্যে যে কোন অবসর সময়ে বিশেষ কোন অঞ্চলের গ্রামসমূহের যে কোন এক কিংবা একাধিক স্থানে যাত্রা নামক এই নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 'জেঠ্‌যাত্রা' নামে পরিচিত জ্যৈষ্ঠমাসে যে নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাহাই প্রধান। .....পশ্চিম বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চল হইতে যাত্রা কথাটি গিয়া যে ওরাও°দিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নহে। ওরাও°দিগের ইহা একটি বিশিষ্ট সামাজিক অনুষ্ঠান; শুধু সামাজিকই নহে, ইহার মধ্যে ধর্মীয় সম্পর্কও আছে.....। অতএব ইহা বাহির হইতে পরবর্তীকালে অন্যের নিকট হইতে ধার করা জিনিস বলিয়া মনে হইতে পারে না। বাংলা ভাষায় যাত্রা কথা যে অর্থে প্রচলিত আছে, তাহাতেও ধর্ম ও আনন্দ এই উভয় ভাবই যুক্ত আছে। অতএব শব্দটি একই ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত বলিয়াও মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে।" (শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৩০–৩২।) এই যাত্রা-শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা থেকে আগত বলে অনুমিত হয়েছে। উভয়তই অন্তত এই সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি যে, যাত্রা কথাটার উৎপত্তির সঙ্গে 'লোক'দের কথাটা জড়িত। তাহলে বলা চলে, আদিবৃত্তির প্রেরণায় মানুষের আনন্দ-লাভের যে সামাজিক বাসনা একদা চরিতার্থ হল নৃত্য গীত ও বাদ্যের সমবেত অনুষ্ঠানে, তা-ই পরিবর্তনের রথে চড়ে পুতুলের সং দেখিয়ে, মঙ্গলগানের পুণ্য বিলিয়ে, কথকতা আর গাথার মাধুরী ছড়িয়ে কালের পথ অতিক্রম করে হাজির হয়েছে এসে যাত্রার আসরে। যাত্রা তাই লোক-নাট্যেরই একটি রূপ; পুতুল সেই সূত্রধার, মঙ্গলগানের প্রধান গায়েন—মাথায় যার তাজ, অঙ্গে লাল বর্ণের চেলী, গলায় পুষ্প-মালা, চামর ও ঘুমুর সহযোগে গানের ধুয়া ধরিয়ে দেয় যে,—কথকতার কথক ঠাকুর, গাথার 'গাথক' আর পালাগানের রচয়িতা বা নাটকের নাট্য-কার বিভিন্ন নামে পরিচিত এঁরা কি সমগোত্রীয় নন? একই জন কি পরিচয়ের খোলস বদলে কালের ঘাটে ঘাটে আনন্দ বিতরণ করছেন না? আমাদের নাটকের ক্রমবিকাশের পথে যাত্রা তাই এক বিশেষ পরিচয়। একদা যেদিন সূত্রধারের পরিকল্পনায় কাহিনীর সংযোজনা করে পুতুলের সং-এরা জন-চিত্তবিনোদনের জন্য মঞ্চে এসে দাঁড়াল, দর্শকবৃন্দের সহযোগী কল্পনায় ভ্রান্তি সৃষ্টি করে পুতুলের সং-এরা আড়ালে থাকা সূত্রধারের

www.pathagar.com

ইচ্ছা ও কথায় বাঙ্‌ময় হয়ে উঠল যেদিন, নাট্য-লতিকায় প্রথম পল্লব যে-দিন মুক্ত হাওয়ায় দুলে উঠল, আর যেদিন আড়ালে থাকা অধিকারী-রচয়িতার কল্প-সৃষ্টির রূপায়ণে কুশীলবেরা যাত্রার আসর বাণীমুখর করে তুলল, তার মধ্যে কালের ব্যবধান অনেক, কিন্তু উদ্দেশ্যের ব্যবধান সামান্যই। ইতিমধ্যে অবিশ্যি নাট্য-লতিকা পল্লবে পল্লবে অনেক ছেয়েছে, এদিকে-ওদিকে লতিয়েছেও কম নয়। কিন্তু সৃষ্টির অস্পষ্টতা কেটেছে অনেক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাণহীন পুতুলের পদ্যের পর্যায়েই প্রাণবন্ত কুশীলবেরা আসরে এসে হাজির হয় নি। আর সূত্রধার আড়ালে থেকে থেকেই যাত্রার অধিকারী-রচয়িতার নবরূপ লাভ করেন নি। পথ-পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়েই সূত্রধার তাজ-চেলী-মালা চামরে সজ্জিত হয়ে নিজেই মঞ্চে এসে হাজির হন। পুতুলেরা তখন অন্য কোন আসরে নৃত্যরত। মঙ্গলগানের প্রধান গায়েন গানের ধুয়া ধরিয়ে দেন, আর "অবশিষ্ট গায়েনরা মৃদঙ্গ ও মন্দিরার সহিত সেই গীতের প্রতিধ্বনি করে।" কিন্তু শুধু কি গানে আর ভাব-বাহুল্যে মানুষের নাট্যবৃত্তি চরিতার্থ হয়? গানের বাহুল্য আর দর্শকের কাহিনী-কল্পনায় কতটুকু সাহায্য করতে পারে? তাই কথক এলেন গানের আসরে। গানের সঙ্গে নিয়ে এলেন তিনি কথোপকথন। কাহিনীর সমস্ত চরিত্রই তিনি। এ ব্যবস্থায় কথক পেলেন রসাভিনয়ের পূর্ণ সুযোগ। আর দর্শক ও শ্রোতৃবর্গ নিজ নিজ আসনে বসে দৃশ্যপট ছাড়াই কথকের কল্পনার সঙ্গে কখনো ভীষণ শ্বাপদসংকুল অরণ্যানিতে, কখনো ফুলে পল্লবে সুশোভিত মুক্ত উদ্যানে, কখনো ঐশ্বর্যভরা রাজপ্রাসাদে পরিভ্রমণ করলেন। 'গাথক'ও অনুসরণ করলেন এই পদ্ধতিই। কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? বলা চলে, রস-সঞ্চারে পুতুলের প্রাণহীনতার ত্রুটি দূর করার উপযুক্ত পন্থা কল্পনাকাররা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মঞ্চ থেকে পুতুল সরিয়ে নতুন নামে সেখানে সূত্রধারের একক দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধাভাজন হয়েও অতৃপ্তি যেন ঢেকে রাখতে পারছিল না দর্শকবৃন্দ। তাই হয়তো কালক্রমে নবরূপী সূত্রধার প্রাণবন্ত পুতুলকে আসরে দাঁড় করিয়ে দৃশ্যত গ্রহণ করলেন গৌণ ভূমিকা। বড়ু চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" নাটগীতে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা ও বড়াই সেজে কুশীলবেরা উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনয় না করলেও তিন গায়েন নাটকীয় ভঙ্গিতেই গীত-সংলাপে আসর জমাতেন। সংগীতের মাধ্যমে হলেও আসরে এই সর্বপ্রথম উক্তি-প্রত্যুক্তির প্রবর্তন হল। দূরে যেন ঘোষিত হল 'নতুন যাত্রা'র আগমন-বার্তা। ক্রমে নবরূপী সূত্রধার বসে পড়লেন আসরের কাছ ঘেসেই বাদ্যকরদের পাশে। তাঁকে আর বাহ্যত দর্শকবৃন্দের চোখেই পড়ল না তেমন। মঞ্চে পুতুলেরা প্রাণ পেল। এমনি করে সতের শতকের পথ-

www.pathagar.com

পরিক্রমা শেষ হল উৎসব-অনুষ্ঠানের অর্থবাহী প্রাচীন যাত্রার। বলা বাহুল্য, ওদিকে ইতিমধ্যে "শিষ্টজন"রা সুউন্নত সংস্কৃত নাটকের বিস্তৃতির গবেষণায় রত।

আনুমানিক আঠার শতকের প্রথম দিকে শিশুরাম অধিকারী প্রাচীন যাত্রার সংস্কারসাধন করে নতুন যাত্রার প্রচলন করেন। (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। অনুসরণ করেন পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম সুবল অধিকারী, লোচন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, পীতাম্বর অধিকারী এবং আরও অধিকারীরা। অধিকারীরা পালা "বাঁধতেন", মুদ্রণ ব্যবস্থা না থাকায় ছাপতে পারতেন না, এবং সে সব পালা হাতছাড়া করতেন না। নকল করতেও দিতেন না কাউকে। তাই যাত্রার পুঁথির বহুল প্রসার সম্ভব ছিল না। পরে অবিশ্যি "ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-লেখক পাঁচকড়ি দে মহাশয় গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা-পালা পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় কৃষ্ণকমল গোস্বামীর পালাগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে ব্রজমোহন রায়ের যাত্রা-পালার মুদ্রণ হইয়াছিল। গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালার মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া যায়।" (বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, শ্রী বৈদ্যনাথ শীল)।

আঠার শতকের যাত্রার কাহিনী ছিল বৈচিত্র্যহীন ও অতি-পরিচিত। কাজেই কোন অধিকারীর যাত্রা দেখে ও শুনে অন্যের পক্ষেও প্রায় তেমন যাত্রার পালা 'বাঁধা' ছিল সম্ভব। তাই মুদ্রণ-ব্যবস্থার সুবিধা তেমন না থাকলেও পালা-গানে দেশ ছেয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। কৃষ্ণ-যাত্রার দু'য়েকটার খানিক নীচে উদ্ধৃত করা হল। (পালা ক'টি প্রবন্ধকারের সংগ্রহ; নিজেরই গ্রামের শ্রী মথুরানাথ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে)। এগুলিকে বলা হত কৃষ্ণ-যাত্রা বা কৃষ্ণ-লীলা।

ধরা যাক, নিমাই-সন্ন্যাস পালা। অধিকারীর প্রতিভূ হয়ে একজন আসরে এসে পালা আরম্ভ করলেন ঃ

"প্রস্তাবক। (গান) একদিন নিধুবনে কিশোর আর কিশোরি
শুয়ে আছেন মনসুখে পুষ্পশয্যা'পরি।।

(কথা) গাছের ডালে ছিল শুক-শারী নামে দু'টি পাখী। নিশি প্রভাত হয়। তখন শুক বলছে শারীকে—

www.pathagar.com

(গান) ও শারী তুই দে গো সাড়া।
সুখের নিশি হল সারা
ও শারী তুই দে গো সাড়া॥

(কথা) কিন্তু শারী বলছে—

(গান) অধিকার নাই গো।
রাই-কানু জাগাইতে
অধিকার নাই গো॥
.....ইত্যাদি।

(কথা) তারপর দু'জনেই একসঙ্গে জাগায় রাই-কানুকে।

(গান) রাই জাগো কানু জাগো শুক-শারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কালো মানিকের কোলে॥
রাই জাগো গো
কানু জাগো গো
.....ইত্যাদি।

(কথা) কৃষ্ণ জেগে বলছেন—

প্রিয়ে! আজ আমি স্বপ্ন দেখেছি।
—কি স্বপ্ন দেখলে প্রভু?
.....ইত্যাদি॥"

এমনি করে পালা এগোয়। স্বপ্ন-বৃত্তান্তে বোঝা যায়, "রাধা-প্রেমের ঋণ শোধিতে" কলিযুগে কৃষ্ণ নিমাই হবেন। প্রস্তাবনার পর আরম্ভ হয় বিভিন্ন চরিত্র মারফত নিমাইর সন্ন্যাস-যাত্রা ও সন্ন্যাস-লাভের কাহিনী।

সময়ের পরিবর্তনে যাত্রা-গানেও দেওয়া-নেওয়া যেমন হয়েছে অনেক, সমাজ বিন্যাসেও জল গড়িয়েছে কম নয়। "শিষ্টজন" গোষ্ঠীর অনেকেই ইতিমধ্যে আর্য-রাজধানী ছেড়ে গ্রামে গ্রামে বসতি স্থাপন করেছেন, এই বাংলা দেশেও শিষ্টতার আলো বিতরণ করেছেন, বাংলা ভাষাকে নিজের ভাষা করে নিয়েছেন, বাংলার অনার্যদের সঙ্গে মিলে-মিশে সংসার-কার্য নির্বাহ করেছেন, এবং চিত্ত-বিনোদনের জন্য ভদ্র-ইতর সবাই এসে বসেছেন গানের আসরে। আর যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নতুন উজ্জ্বল আলোকের প্রসাদে একদা ইতরজনেরাও শিষ্টের প্রতি অনেকটা শ্রদ্ধাবান হয়েছেন। ফলে আদি-বৃত্তির প্রেরণা প্রকাশের বিষয়বস্তু ও কায়দায় পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। দেবতাও তখন নেই, ঋষিগণও নেই, অসুর-দৈত্যও নেই। নতুন নামে সকল পক্ষেই যারা আছেন, মিলে-মিশেই আছেন।

www.pathagar.com

সংস্কৃত নাটকও তখন প্রাসাদে রক্ষিত আছে। দেখা যায়, ধর্মীয় বিষয়-বস্তু নিয়ে রচিত হচ্ছে যাত্রার পালা। সংস্কৃত নাট্য-রীতির প্রভাব পড়েছে তার উপর। তবুও যাত্রা সংস্কৃত নাটক থেকে ছিল আলাদা। নীচে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের একটা মোটামুটি খসড়া দেওয়া হল।

যাত্রা :

(১) পালার নাম সব রকমই হতে পারে।

(২) দৃশ্য হবে এ-দেশেরই।

(৩) নায়ক-নায়িকার জাত-বিচার তেমন নেই। তবে তারা সাধারণ পর্যায়ের ও নয়। কালক্রমে বিষয়বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নায়ক-নায়িকারা

(৪) স্বাভাবিকভাবেই উচ্চবংশজাত হয়ে ওঠে।

(৫) নাটকে দুর্বৃত্ত থাকবে।

(৬) প্রধানত ধর্ম বিষয়কে কেন্দ্র করেই পালা রচিত হবে।

(৭) নাটকে সব রসই থাকবে। আর থাকবে শ্লীল ও অশ্লীল ভাঁড়ামো। কিন্তু মিলনাত্মক হতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং বেশির ভাগ পালাই বিয়োগাত্মক।

(৮) প্রথম সবই গান। পরে গদ্য এসে যাত্রায় আসন গাড়ে। ক্রমশ কথোপকথনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং গানের পরিমাণ কমতে থাকে। তবুও যাত্রা থেকে যায় গীতি-বহুল।

সংস্কৃত নাটক :

(১) নাটকের নাম হবে নায়ক-নায়িকার নাম মিলিয়ে।

(২) দৃশ্য হবে ভারতবর্ষের।

(৩) নায়ক হবেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অর্থাৎ আর্য।

(৪) নায়িকাও হবেন উচ্চবংশজাতা।

(৫) নাটকে অনেক দুর্বৃত্ত থাকতে পারে।

(৬) সাধারণত প্রেম এবং বীরত্বকে কেন্দ্র করেই নাটক রচিত হবে।

(৭) নাটকে আদিরস, হাস্যরস, প্রেম ও বিরহ থাকবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা বিয়োগাত্মক হবে না। শেষে গিয়ে মিলনাত্মক হতেই হবে।

(৮) নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ থাকবে। তাছাড়া নাট্য-আইনের যথাযথ সংরক্ষণ তো হবেই।

www.pathagar.com

(৯) চরিত্রের জটিলতা ও ঘটনা-সংঘাতে তা হবে প্রকৃত নাটক।

(১০) গান থাকবে খুবই পরিমিত।

এতে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংস্কৃত নাটকের পাশাপাশি চলে যাত্রা নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলেও সংস্কৃত নাটকের কাছে তার দেনার পরিমাণ কম নয়। বৃহত্তর সম্ভাবনা-ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকতার পথে ক্রমে নাট্য-রূপ পরিগ্রহ করলেও বলিষ্ঠ হাতে নিজ-রূপের পরিমার্জনা সে করতে পারে নি। অশিক্ষা-অনটনের দুর্বলতায় সে অন্যের জিনিস দেহে পরেই খুশী হয়েছে। প্রাণোন্নয়নের পথে তৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা করে নি। ভিত্তি-ভূমির বাসিন্দাদের অবুঝ দাবীকে খুশী করতে গিয়ে অশ্লীলতার ক্লেদ গায়ে মাখতেও কুণ্ঠাবোধ করে নি। এসব কারণেই বয়োবৃদ্ধ হয়েও সে থেকে গেছে অমার্জিত এক গুণবান শিশু। এমনি অবস্থায় সে পা বাড়ালো উনিশ শতকে।

পাশ্চাত্ত্যের নাটক যখন এ দেশের উদ্দেশ্যে সাগরে পাড়ি জমিয়েছে, তখন আমাদের বাংলা নাটক বলতে রয়েছে দুর্বল যাত্রার পুঁথি। বাংলা দেশে সংস্কৃত নাটক তখন পোকার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

দেবতাদের পর এ দেশে রাজা-বাদশাদের জাঁকজমক চলেছে বহুদিন। বহুদিন শিষ্টজনেরা ব্যস্ত থেকেছেন ছোট বড় সকল রাজধানীর সভা ও দরবারের আনাগোনায়। ফলে বৃহত্তর জনসমাজ রয়ে গেছে স্থিতাবস্থায় অপরিবর্তনীয়, অনড়। তাদের গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল। তারাভরা আকাশ ছিল, মৃত্যুভরা বাতাস ছিল, আর ছিল আদি-বৃত্তির প্রেরণাভরা হৃদয়। বাংলা সাহিত্যের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। নাট্য সাহিত্যের তো কথাই নেই। অথচ পাশ্চাত্ত্যে তখন জীবনের জয়-রথ দ্রুতগতিতে চলমান। পরিমার্জনার পথে Mystery ও Miracle Play আধুনিক নাটকের সৃষ্টি করেছে। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় রেনেসাঁ প্রাচীন কুসংস্কারের হাজারো নাগপাশ থেকে মুক্তি দিয়ে জাতীয় জীবনকে করে তুলেছে আত্মবোধের আনন্দে ও বিশ্বাসে মহীয়ান। নাটকেও হয়েছে তার সেই জীবনের প্রকাশ। কিন্তু বাংলা দেশ? প্রাচীন বিশ্বাসের ভারে অবনত, অবারিত আকাশ তলে থেকেও জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সীমিতদৃষ্টি। এমনি অবস্থায় দেশে লাগল এসে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ঢেউ। এত দূর থেকে আসা ঢেউ, শক্তি তার কত থাকে! সর্ববিধ দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে জীবনের জয়গাথা শোনাবার জন্যে তা যথেষ্ট ছিল না। ঢেউ যারা নিয়ন্ত্রণ করতেন, ঢেউকে কাজে লাগানোর সদিচ্ছাও তাদের বোধ হয় তেমন ছিল না। তবে ইংরেজি নাটক মুগ্ধ করল নাট্যপিপাসুকে। অনেকটা

www.pathagar.com

বশীকরণের মতই। আর এই বশীকরণ হল যাত্রা তথা ধর্মবিষয়ক রচনা 'নাটক'-এ রূপান্তরিত হওয়ার আগেই। "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম যে নাট্যরচনা আবির্ভূত হইল, তাহা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজি সাহিত্যের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই যাত্রার মধ্যে নূতন উপাদান প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়া ইহার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লুপ্ত করিয়া দেয়। ধর্ম ভাবের বিকাশই প্রাচীন যাত্রাসমূহের লক্ষ্য ছিল, কিন্তু এই সময় হইতেই যাত্রার ধর্মভাব হ্রাস পাইতে থাকে।" (বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৯)। পরমানন্দ অধিকারী প্রমুখ রচয়িতাদের সংস্কারের ফলে তখন প্রাচীন যাত্রায় যে নাট্যিক ক্রিয়া ও গদ্য সংলাপ যোজিত হল, তাতে কিছুটা প্রাণস্পন্দন এলেও যাত্রা খুব জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি। বরং সেই সুযোগে বিদ্যাসুন্দরী রসের যোগান দিতে যাত্রায় এসে হাজির হত মালি-মালিনী, মেথর-মেথরানী, নাপিত-নাপিতানী প্রভৃতির রুচিহীন ভাঁড়ামো। উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৃষ্ণকমল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে যাত্রার পালা বেঁধে প্রাচীন যাত্রার আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভাঙা কলস জোড়া লাগে নি। ওদিকে উনিশ শতকের প্রারম্ভেই নাটকের জোয়ারী বাতাসে দুলে উঠেছে বাংলার সংস্কৃতিবান জীবন-পল্লব। ইংরেজি নাটকের প্রভাবে বাংলা নাটকের উৎপত্তি হচ্ছে। আর একই সময়ে বাংলায় অনূদিত হচ্ছে সংস্কৃত নাটক। স্বাভাবিকভাবেই এইসব অনুবাদে সংস্কৃত নাটকের ভাব ও আঙ্গিক রক্ষিত হত। এই সময়ে রচিত মৌলিক নাটকের মধ্যেও ইংরেজি নাটকের যথার্থ রস পরিবেশিত হয় নি। দুটি প্রধান ধারায় তখন মৌলিক নাটক রচিত হত ঃ প্রথমত, পৌরাণিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে; দ্বিতীয়ত, তদানীন্তন সমাজের সাময়িক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অবলম্বন করে। "ক্রমেই বৈদেশিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গ-মঞ্চের প্রভাব সর্বজয়ী হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহার কোন কোন উপকরণ গিয়া 'নতুন যাত্রা'র মধ্যে প্রবেশ করিল—তখন যাত্রা আর এক নূতন পরিচয় লাভ করিল—তাহা গীতাভিনয়।" (বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪০)। তাই একথা বলা চলে, প্রধানত সংস্কৃত নাটকের প্রাণরস প্রাশ্চাত্ত্য নাটকের পাত্রে পূরিত হয়ে বাংলা নাটক আত্মপ্রকাশ করে। আর যাত্রা—যার উপর সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আগে থেকেই পড়েছিল—বাংলা নতুন নাটকের প্রভাবের মধ্য দিয়ে প্রাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রভাবও কিছুটা গ্রহণ করল। আর বাংলা নাটকও—বিশেষ করে সামাজিক প্রহসন—যাত্রার লোকপ্রিয় কায়দাকানুনও যে কিছুটা গ্রহণ করে নি, তা নয়। শেষতক তাহলে এই দাঁড়ায় যে, বাংলা নাটক

www.pathagar.com

হল এক মিশ্র বস্তু। এবং যাত্রা ও সংস্কৃত নাটকের মধ্যে ব্যবধান যতটা ছিল, পরস্পর প্রভাবের ফলে বাংলা নাটক আর যাত্রার মধ্যে ততটা ব্যবধান রইল না। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে তো সে ব্যবধান আরও কমে গেল। শেষদিকে অনেক বাংলা নাটকই গীতাভিনয়ে বা অপেরায় অভিনীত হয়েছে। যেমন—হরিশচন্দ্র, চন্দ্রহাস, শ্রীরাধা প্রভৃতি। তাছাড়া ঐতিহাসিক নাটকের জোয়ার আসার পর তো অনেক ঐতিহাসিক নাটকই 'যাত্রায়' অভিনীত হয়েছে। তবুও তারা পৃথক থাকল। এবং সে পার্থক্য অন্তরের যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি বাইরের। সে পার্থক্য অভিনয়-ব্যবস্থার, প্রয়োগ-পদ্ধতির এবং লোকপ্রিয়তার। এমন অপেরার পালা আছে যার রচনা-শৈলী অনেক নাটকের রচনা-শৈলীর চেয়ে অধিকতর নাট্যকীয়। বিবেকের গান ও আঙ্গিকের দু'একটা দিকের কথা বাদ দিলে অনেক নাটক আর অপেরার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে। নীচে দু একটা উদ্ধৃতি দেওয়া হল।

'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের রসিকা আত্মপরিচয় দিচ্ছে ঃ

"বাড়ী মোর বংশীপুরে দেখা যায় কিছু দূরে.
ঘেরা-ঘোরা ঘর দুইখানি।
নবীনা যুবতী আমি মরেছে আমার স্বামী,
তবু কোন দুঃখ নাহি জানি।।
তৃষিত পথিকগণ এসে করে আকিঞ্চন,
যদি পায় মোর ঘরে বাসা।
নাহি যায় অন্যস্থান করে সবে অবস্থান
এমন আমার ভালবাসা।।"

বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয়ের মালিনীর কথায় ও চরিত্রে এর যে ব্যতিক্রম ছিল না, তা অনুমান করা চলে।

ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'চন্দ্রহাস' যাত্রায় রাজ্যহারা সন্ন্যাসী রাজা দধিমুখ পনের বছর পর দেশে ফিরে এসে বলেছেন ঃ

"একে একে কেটে গেল পঞ্চদশ বর্ষ;
ডুবে গেল কালচক্র অতীতের কোলে।
আজিকার এমন দিবসে, মনে পড়ে,
বিষজর্জর তনু, বিসর্জিত হয়েছিনু

www.pathagar.com

শত্রুর চক্রান্তে, অগাধ বারিধি-বক্ষে।
মৃত দেহে জীবন লভিনু যদি, দেখিব না
সাম্রাজ্য আমার ? লইব না
বক্ষে তুলে ধূলিকণা তার ? দেখিব না
কোথা গেল প্রিয়পুত্র চন্দ্রহাস মোর ?
—ইত্যাদি।"

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা' নাটকে পুত্র বিচ্ছেদে মানসিক দ্বন্দ্বে জনা বলছে ঃ

"মমতা এস না বক্ষে মম,.....
নখাঘাতে উৎপাটন করিব নয়ন,
বিন্দু বারি যেন নাহি ঝরে।
বীর-অবতার, অসহায় পড়েছে কুমার,
প্রেত-আত্মা তার, নিত্য আসি মা বলে ডাকিবে,
নিত্য আসি করিবে ভর্ৎসনা।
—ইত্যাদি।"

যাত্রার পালা 'চন্দ্রহাস' ও মঞ্চ-নাটক 'জনা'র দুটি উদ্ধৃতি যাত্রা ও নাটকের নৈকট্যই প্রমাণ করে না কি ?

কাজেই দেখা যায়, রচনাশৈলীর গুণ বিচার করে ঐ সময়ের, বিশেষ করে উনিশ শতকের নাটক আর যাত্রার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্যের সীমারেখা টানা যায় না। তবুও পার্থক্য আছে। পুতুল খেলার সূত্রধার, যিনি পরবর্তী-কালে মঞ্চে পুতুলের স্থান দখল করেছিলেন এবং তারও পরবর্তীকালে যিনি আবার বসে পড়েছিলেন আসরের পাশে, তিনি একেবারে আড়ালে কিছুতেই যেতে পারেন নি। বিবেকরূপে যেন তিনি আবার এসে হাজির হন। সেদিন পর্যন্তও যাত্রা 'বিবেকহীন' হতে পারে নি। কিন্তু নাটক হয়েছে 'বিবেকহীন'! (তবুও নাট্যকার কি সুযোগ পেলেই চরিত্রের কাঁধে ভর করেন না ? অনেক সংলাপই কি চরিত্রের মনে না হয়ে নাট্যকারের বলে মনে হয় না ?) অনেক আগে যাত্রায় বালিকাবেশী বালকেরা 'জুড়ি' নামে আসরে এসে যথাক্রমে আসরের চারধারে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে পূর্ববর্তী কালের প্রস্তাবকের কাজটা সম্পন্ন করত। পরবর্তীকালে এই রেওয়াজ উঠে যায়। কিন্তু আসরে থেকে যায় নর্তকীর দল। বলা বাহুল্য, থিয়েটারেও 'নর্তকীরা' নাচে।

www.pathagar.com

যুগের পরিবর্তনে যাত্রাও নিজের নিজের সীমায় তার রূপ বদলেছে। হালযামানার যাত্রাভিনয়ের পালার নাম হয় "চাষীর ছেলে", "মানুষ" "ভিখারিণী" "বন্দীর ছেলে" ইত্যাদি। বলা চলে এগুলো সবই সামাজিক যাত্রা। তবে প্রয়োগ-বিধান তার পুরনো যাত্রার রীতি মানে আজও। এসব দিক চিন্তা করে বলতে হয়, যাত্রা মানেই নীচু মানের কিছু নয়, আর বাংলা নাটক মানেই উঁচুমানের কিছু নয়। মান সবার আগেও ছিল, এখনও আছে। বরং ভালমন্দের রেঞ্জটা বাড়িয়ে দিয়ে, সাধারণ অসাধারণ সকল বাংলাভাষাভাষী দর্শককে শুধু 'দর্শক' ভেবে নিয়ে, বর্তমানের যাত্রা ও নাটককে শুধু বাংলা নাটক নামে অভিহিত করাই উচিত। তারপর বোধ হয় বাংলা নাটককে দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ প্রাচ্য-ধর্মী বাংলা নাটক ও পাশ্চাত্ত্য-ধর্মী বাংলা নাটক। গত এক শ' বছর ধরে বাংলা ভাষায় যে সব নাটক প্রকাশিত হয়েছে, তার একটা মোটামুটি পর্যালোচনা করলে এ জিনিসটাই ধরা পড়বে। নীচের তালিকায় তারই চেষ্টা করা হয়েছে।

সময়	প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা	সময়	প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা
—১৮৫৫	৬	১৯০১—০৫	৭৩
১৮৫৬—৬০	২৬	১৯০৬—১০	৯১
১৮৬১—৬৫	২১	১৯১১—১৫	১১১
১৮৬৬—৭০	৬৬	১৯১৬—২০	৭৫
১৮৭১—৭৫	১৩৭	১৯২১—২৫	৫৮
১৮৭৬—৮০	৭৪	১৯২৬—৩০	৭৯
১৮৮১—৮৫	৬৯	১৯৩১—৩৫	৬৮
১৮৮৬—৯০	৭৯	১৯৩৬—৪০	৮৩
১৮৯১—৯৫	৬২	১৯৪১—৪৫	৫১
১৮৯৬—১৯০০	৭১	১৯৪৬—৫০	৪১

মোট ঃ—১৩৪১

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের পরিশিষ্ট (ক)-তে যে প্রকাশিত বাংলা নাটকের তালিকা দিয়েছেন, এই তালিকাটি তার থেকেই প্রস্তুত করা হয়েছে। এই তালিকায় 'সময়' প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় ১৯৫২ সন থেকে। ১৯৫১ ও ১৯৫২ সনে প্রকাশিত নাট্য-সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৬ এবং ১২। তাহলে ১০০ বছরে মোট প্রকাশিত নাট্য-সংখ্যা হয় ১৩৫৯। অর্থাৎ এই ১০০ বছরে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ১৪টা করে নাটক প্রকাশিত হয়। নাট্য-সংখ্যা দিয়ে যে রৈখিকচিত্র

www.pathagar.com

পাওয়া, তা থেকে বাংলাদেশের নাট্যসাধনার গতিপথের মোটামুটি সন্ধান মিলবে। ১৯৫২ সন থেকে আরম্ভ করে এই গতিপথ ১৮৮০ সন পর্যন্ত ঊর্ধগামী হয়েছে। তারপর ১৯৪০ পর্যন্ত তা দীর্ঘায়িত হয়েছে প্রায় সমান্তরাল ভাবেই। কিন্তু ১৯৪০ সন থেকে তার গতি নিম্নমুখী। এই ১০০ বছরের মধ্যে দুইটি সময়ে, ১৮৭১ থেকে ১৮৭৫ সন এবং ১৯১১ সন থেকে—বলা যায় ১৯০৬ সন থেকে ১৯১৫ সন, নাট্য-সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে অনেক। স্মরণীয় যে, ১৮৭২ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। দীনবন্ধু মিত্র এবং আরও অনেক নাট্যকার তখন নাট্য-রচনায় ব্যস্ত। আর পরের সময়টায় নাটক লিখেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই সাড়ে তের শ' নাটককে যদি মোটামুটি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং 'সামাজিক ও বিবিধ' এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে গণনায় দেখা যাবে, পৌরাণিক নাটক আছে এর মধ্যে শতকরা ৩৬ ভাগ ঐতিহাসিক শতকরা ২৩ ভাগ ও 'সামাজিক ও বিবিধ' শতকরা ৪১ ভাগ। আর এই এক শ' বছরকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করে কোন্ সময়ে কোন্ নাটক কি হারে রচিত হয়েছে, তা জানার চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে, বেশি থেকে কম সংখ্যার ক্রম অনুসারেঃ

প্রথম দিকে—'সামাজিক ও বিবিধ', পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক;

মধ্যের দিকে—পৌরাণিক, 'সামাজিক ও বিবিধ' এবং ঐতিহাসিক;

এবং শেষের দিকে—'সামাজিক ও বিবিধ', ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছে।

এইভাবে তার ক্রম নির্ণীত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম দিকে বিধবা-বিবাহ নিয়ে খুব হৈ চৈ হচ্ছিল। তাই বিধবা বিবাহ নিয়ে নাটকও রচিত হয়েছিল নিতান্ত কম নয়। প্রথম দিকে সামাজিক নাটক রচনার সংখ্যাধিক্যও এই কারণেই। এই এক শ' বছরকে দু'ভাগ করে নিলে বলা যায়, প্রথম ভাগে প্রধানত প্রাচ্য-ধর্মী নাটক রচিত হয়েছে, এবং দ্বিতীয় ভাগে রচিত হয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক পাশ্চাত্ত্যধর্মী নাটক। সন্নিবিষ্ট তালিকায় যাত্রার পালা বড় একটা স্থান পায়নি। যাত্রার সকল পালাসহ কাজেই, নাট্য-সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে।

পাশ্চাত্ত্যের কোন নাট্যপিপাসু যদি আমাদের বাংলা নাট্যাভিনয়ের অডিয়েন্সে হাজির থাকেন, তাহলে তিনি হয়তো আমোদিত হবেন নতুন রকমের নাটকের সন্ধান পেয়ে। কিন্তু যদি বলা হয়, পাশ্চাত্ত্যের নাটকের

www.pathagar.com

শাগরেদী করছি আমরা এবং এ হচ্ছে বাংলাতে পাশ্চাত্ত্য-নাটক, তাহলে তাঁর কপালে চিন্তার রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠারই কথা। তেমনি সতের শতকের কোন অধিকারী যদি প্রাণ পেয়ে আমাদের বর্তমান যাত্রাভিনয়ের দর্শক-মণ্ডলীতে উপস্থিত থাকেন, তাহলে বেশ কিছুক্ষণ অভিনয় উপভোগ করার পর পাশের দর্শককে হয়তো জিজ্ঞাসাই করবেন, যাত্রা কখন আরম্ভ হবে। তবে বর্তমানে এদেশবাসী আমরা যারা আছি, তাদের প্রায় সবাই যাত্রার অভিনয় দেখেই হোক আর নাটকের অভিনয় দেখেই হোক যথেষ্ট তৃপ্তি পাব। কারণ আমরা জানি, যাত্রা বা নাটক এই-ই হয়। এ তো জানিই যে নাটক হয় বাঁধা মঞ্চে, তাতে দৃশ্যপট থাকে, যবনিকা থাকে। আর যাত্রা হয় খোলা মঞ্চে, তাতে দৃশ্যপট এবং যবনিকা থাকে না। শুধু গান-বাজনার যারা বেশি অনুরাগী, তাঁরা বেশি পছন্দ করবেন যাত্রাকে। দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক শেষের দলের। তারা যে নাটক দেখতেও পিছপা হবেন, তা নয়। কিছু কিছু গান-বাজনা থাকলেই হল। এবং আমাদের প্রাচ্যধর্মী অধিকাংশ নাটকেই তা থাকে।

বক্তব্যটাকে আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্য এখানে সুদীর্ঘ এক উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। "বস্তুতঃ আমাদের থিয়েটার যাহারই পরিমার্জিত সংস্করণ, তাহার আর একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, এখনও থিয়েটার হইতে যাত্রার প্রধান অঙ্গ গান বর্জন করিতে পারা যায় নাই। আমরা চিরকালই গানের পক্ষপাতী এবং এই প্রবৃত্তি আমাদের এত প্রবল যে, শ্মশানে-মশানে, যুদ্ধ-ক্ষেত্রেও আমরা গান শুনিতে চাই। এইজন্য এখানে সাবিত্রী ও বেহুলা স্ব স্ব মৃত পতি কোলে করিয়া গান গায়, মশানে উত্তোলিত খড়্গের নিম্নে দাঁড়াইয়া শ্রীমন্ত চন্ডীর গান ধরিয়া আসর জমায়, সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যু ভক্তিপূর্ণ গান গাহিয়া কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রে পরিণত করে। এই সিনেমা-থিয়েটারের যুগেও যে যাত্রার জনপ্রিয়তা বেশী কমে নাই তাহার একটি প্রধান কারণ—আমাদের এই সঙ্গীতপ্রিয়তা।

এদেশের জনসাধারণের এই মনোভাব থিয়েটার প্রবর্ত্তকদের অবশ্য অজ্ঞাত ছিল না। সেইজন্য তাঁহারা প্রত্যেক নাটকে গান দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। ...অনেক সময় নাটকের বিষয়বস্তুর সহিত এই সকল গানের বিশেষ সম্পর্ক থাকিত না। সুতরাং সেগুলি গাওয়া না হইলে নাটকের কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু দর্শকদের তৃপ্তির জন্য সেগুলি গাহিতে হইত। যদি নাট্যকার গীত রচনা করিতে অপারক হইতেন, তাহা হইলে অপরকে দিয়া গান লিখাইয়া লওয়া হইত। এখনও তাহা হইয়া থাকে। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের পরিচালনায় 'লীলাবতী'

www.pathagar.com

নাটকের যে অভিনয় হয়, তাহাতে সাত আটটা গান বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি নাটকের শেষে একটা গান সময়মত রচিত না হওয়াতে উদ্যোক্তারা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কারণ, ভোজের শেষে মিষ্টান্নের ন্যায় নাটকের শেষে একটা গান তখন অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহা হউক, নাটকটির প্রথম অভিনয়ের দিন একটা প্রাচীন খেমটা গান কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গাওয়া হইয়াছিল, তাহাতে নাকি সেদিনের আসর রক্ষা. রস রক্ষা ও মান রক্ষা' হইয়াছিল!" (বাংলা নাট্যকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, এম. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯, পৃঃ ৮৯-৯০)।

১৮৭৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে নাট্যকার মনোমোহন বসু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন ঃ "আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশ্যতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান নইলে চলে না—আনন্দের কার্য্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন এদেশে বহুকালের প্রথা, যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালী, মরিচা, তর্জা, ভজন, কীর্ত্তন, ঢপ, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, পদাবলী, বাউলের গান প্রভৃতি বহু বহু প্রকার গীতিকাব্যের প্রচলন হইয়াছে—অধিক কি, যে দেশে দিনভিখারী ও রাতভিখারীরাও গান না গাইলে বেশী ভিক্ষা পায় না—সে দেশের হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং রং ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদূর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, তাহার কারণ কেবল গান ভিন্ন আর কিছুই না। আমি এমন কথা বলিতেছিনা যে, যাত্রাওয়ালা যেমন কথায় কথায় অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য করিয়া থাকে নাটকও তদ্রূপ হউক। আমরা চাই, দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহা ধ্বংস না করিয়া

www.pathagar.com

তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে সংশোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।"

এই সঙ্গে এখানে উল্লেখ্য যে সতের শতকের শেষভাগে ও আঠার শতকের প্রথমভাগে ইংল্যাণ্ডেও বড় বড় রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ তাঁদের দর্শকবৃন্দের তুষ্টি বিধানার্থে বহু অর্থ ব্যয়ে ইতালিয়ান গায়ক ও ফরাসী নর্তকদের পোষণ করতে বাধ্য হতেন। নইলে তাদের প্রেক্ষাগৃহে যথেষ্ট সংখ্যক দর্শক সমাগমের অভাব ঘটত।

এসব মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেও বলতে হয়, দর্শকবৃন্দের রুচি দ্বারা পুরোপুরি চালিত হয়ে আমাদের নাট্যরচনার পথে অগ্রসর হতে হবে, এমন কথা নয়। দর্শক-রুচিকে সময়ের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে পুনর্নির্মাণও নাট্যশিল্পীদের দায়িত্ব। আর সর্বকালের রঙ্গালয়ে হাস্যকৌতুকময় তরল রঙ্গনাট্যও যেমন থাকবে, তেমনই তারই পাশাপাশি গড়ে উঠবে উন্নতমানের নাট্য-প্রচেষ্টা। অধ্যাপক থেলার (Thaler) বলেছেন ঃ "The popularity of musical extravaganza need discourage no lover of legitimate drama and no honest fancier of what is best in that jolly jingling kind need be ashamed of his predilection. On the other hand, good comedy and good tragedy are not dead. Pinero, Jones and Barrie, Stephen Phillips, Galsworthy, Masefield, Synge, Bernard Shaw and a lot of others hold the stage in the flesh or in the spirit." (বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমাবিকাশ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু... ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ৯৩-৯৪)।

পাশ্চাত্ত্য-ধর্মী নাটকও আমাদের ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে। কিন্তু সে সব নাটকের সমঝদারেরা করুণভাবে সংখ্যালঘিষ্ট। সংখ্যাগরিষ্ঠেরা তা সম্যক উপলব্ধিও করেন না, উপলব্ধি করার জন্য মনের প্রেরণাও পান না। অথচ সমগ্র জাতির নাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটাতে পারলে আমাদের নাটকের প্রকৃত সাফল্যও আসবে না, তার সার্থকতাও থাকবে না। যাত্রাভিনয়ের লোকপ্রিয়তার কথায় ইউরোপীয় নাটকের জনপ্রিয়তার কথা এসে পড়ে। আজকের পরিণত ইউরোপীয় নাটকের প্রাণ ও রূপ দেখে তার অতীতের কথা কল্পনা করা বেশ কষ্টকর। কিন্তু বাংলা নাট্য-কর্ম চেহারা বদলালেও স্বভাব তেমন বদলাতে পারে নি। ইউরোপীয় নাটকের ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তার সঙ্গে

www.pathagar.com

সামাজিক ব্যবস্থা ও মানসিক অবস্থার আনুকূল্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কালে কালে সেখানে রাষ্ট্রের উন্নতি হয়েছে। আর রাষ্ট্রের উন্নতি সকল দেশবাসীকেই উন্নত করেছে। নতুন সংস্কৃতির আলোকে আলোকিত হয়েছে সমগ্র দেশ। অসাধারণ ও সাধারণের ফারাক সেখানে না বেড়ে বরং কমেছে। দেশের লোক-সংস্কৃতিকে অবহেলায় বিদায় না করে দুনিয়ার জ্ঞান-সম্পদের দানে তাকে উন্নত মানে রূপায়িত করা হয়েছে। আর সেই উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে দেশের ছোট-বড় সকলেই। পরিবর্তিত নাট্যরূপও তাই তাদের কাছে অপরিচিতের মত পর হয়ে থাকে নি। কিন্তু বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তা হতে পারছে না। একই ভূমিতে এখানে দুই জীবন, দুই চিন্তা। দুই চিন্তার উত্তাপে মাঝে-মধ্যে আনন্দ-বারি সিঞ্চন করে যেসব অনুষ্ঠান তা-ও এখানে দুই। দুই-এর সমস্যায় এক-এর সমাধান আনতে না পারলে আমাদের নাটক সৃষ্টি সার্থক হবে কিনা, তা-ই আজ বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্ন নাট্যকারের, প্রযোজকের, অভিনেতৃবৃন্দের, প্রতিটি সংস্কৃতিসেবীর। এ প্রশ্ন আজ সমগ্র জাতির।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জী

১। The Bengali Drama, P. Guha Thakurta, London. 1930

২। বঙ্গীয় নাট্যশালা, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, তৃতীয় সংকরণ, ১৩৬১

৩। The Literature of Bengal, Ramesh Chandra Dutt, 1877

৪। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, এম. এ., দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৯

৫। প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৮৫৭-১৮৫৯ : কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, মস্কো

৬। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সাংস্কৃতিক রূপান্তর, আবদুল মওদুদ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৯

৭। The Indian Middle Class : Their Growth, B. B. Misra

৮। বাঙ্গালী ও তাহার নাট্য সংস্কার, দেশ সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৫

৯। সাহিত্য বিচার, মোহিতলাল মজুমদার, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৬৬

১০। Eighteen Fiftyseven, S. N. Sen, London, 1928

১১। Education of India, Arthur Mayhew, Ministry of Information and Broad casting, New Delhi, 1958

১২। বাঙ্গালী বিদ্বৎ সমাজের সমস্যা, চতুরঙ্গ, ১৩৬৪ বৈশাখ।

১৩। বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্যসাহিত্য, ডক্টর প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, কলিকাতা, সাহিত্য শ্রী, ১৯৭৬

১৪। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত, যোগেন্দ্র নাথ বসু,

১৫। মধুসূদনের নাটক, শ্রী ভবানী গোপাল সান্যাল সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৬৮

www.pathagar.com

১৬। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা নাটক ও নাট্যশালা, মন্মথ রায়, কলিকাতা, ১৯৬৫

১৭। দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, ডক্টর প্রভাত কুমার গোস্বামী, কলিকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৩৮৫

১৮। Memories of My Life and Times, Bipin Chandra Pal, Calcutta, 1932

১৯। গিরিশচন্দ্রের নাট্যচিন্তা, প্রবোধবন্ধু অধিকারী সম্পাদিত, ১৯৭৮

২০। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সুপ্রকাশ রায়, ১৯৭২

২১। Swami Vivekananda– Patriot and Prophet, Dr. B. N. Datta

২২। ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, প্রবন্ধ মঞ্জরী, ১৯০৫

২৩। রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৯৭২

২৪। বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা, ১৩৭৩

২৫। জনযুদ্ধ, ৮ই নভেম্বর ১৯৪৪, কলিকাতা

২৬। উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার, মুনতাসীর মামুন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯

২৭। ভারতী, মাঘ ১৩০২, কলিকাতা

২৮। The Life and Times of Shakespeare, Paul Hamlyn, London etc.

২৯। পূর্বপাকিস্তানের নাট্য আন্দোলনের বিশ্লেষণাত্মক ইতিহাস ঃ ঢাকা মঞ্চ, ডক্টর রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক সংবাদ পত্রিকা 'সংযোগ', ১৯৬৫

———

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

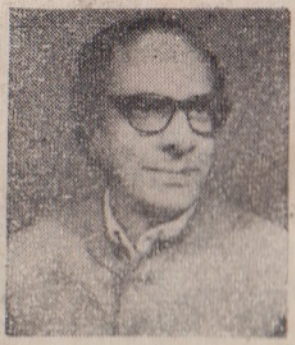

নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ। প্রকৃত নাম এম. ওবায়দুল্লাহ, এম. এস. সি., পি. এইচ. ডি.। জন্ম ৩০ মার্চ ১৯২৫। ময়মনসিংহের মাইজহাটি গ্রামে। ১৯৫১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগে যোগদান। প্রফেসার হিসেবে অবসর গ্রহণ ১ জানুয়ারী ১৯৮৬।

১৯৪৭-এর পর মূলত আরম্ভ হয় জনাব শাইখের নাট্য-সাধনা। তাঁর প্রথম নাটক 'বিরোধ' মঞ্চস্থ হয় ১৯৪৯ সালে, ফজলুল হক হলের বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানে। মুসলিম সমাজভিত্তিক প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসাবে এর রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। তাঁর প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা ৫২। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে এর অধিকাংশই মঞ্চস্থ হয়েছে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ ছাড়া জনাব শাইখ মঞ্চ-রেডিও-টেলিভিশনের একজন খ্যাতনামা অভিনেতা-নির্দেশক। তিনি দীর্ঘকাল যাবত রেডিও ও টেলিভিশনের জন্য নিয়মিত নাটক লিখে আসছেন এবং নির্দেশনা করছেন।

এদেশের মানুষের মন ও মানস, তাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও চেতনা, তাদের জীবন সংগ্রাম ও আশা-বাসনার প্রতিফলন তাঁর নাট্যকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অনলস নাট্যকর্মী। বাংলা নাটকের উন্নয়নে তাঁর অবদান অসামান্য। চারদিকে আজ নাট্য-প্রয়াসের যে শুভ কর্মচাঞ্চল্য বিদ্যমান, তার সূচনাকারীদের প্রধান পুরুষ জনাব শাইখ। পঞ্চাশ দশকের আরম্ভ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাইরে এবং ৭০ সাল থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত স্বগৃহে 'নাট্য একাডেমী' স্থাপন করে তিনি বহু উৎসাহীকে হাতে-কলমে নাট্য বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য তিনি একজন সফল অভিনেতাও। ১৯৬১ সালে নাট্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পান 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার'। আর এবার ১৯৮৬ সালে তিনি পেলেন জাতীয় পুরস্কার 'একুশে পদক'।

তোফা হোসেন